মহানিষ্ক্রমণ

শিশিরকুমার বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

মহানিষ্ক্রমণ

শিশিরকুমার বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৭৫

মূল্য : ৮·০০

সুগত
শর্মিলা
সুমন্ত্র
ও
তাদের হাত দিয়ে একালের
ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে যারা
সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের ভারত
গড়বে

ভূমিকা

সুদূর পাঞ্জাবের লায়ালপুরে জেল থেকে মুক্তি পেলাম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মাস খানেক পরে, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে। জেলের গেট থেকে বেরিয়েই চমকে গেলাম। মনে হল যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে এসে পড়েছি। লোকের ভীড় ও ফুলের ছড়াছড়ি। টাঙ্গা চড়িয়ে যখন আমাকে সমারোহ করে শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন উত্তেজিত জনতার মুখে নতুন এক শ্লোগান শুনে বেশ বিব্রত হলাম—'বোস খান্দান্ জিন্দাবাদ্'! আগের বছর টাঙ্গা করে হাতকড়া লাগিয়ে যখন আমাকে স্টেশন থেকে জেলে নিয়ে এসেছিল তখন আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। কি অদ্ভুত পটপরিবর্তন!

পাঞ্জাব থেকে কলকাতার পথে ট্রেনে আসার সময় স্টেশনে স্টেশনে একই অভিজ্ঞতা হল। কলকাতা ফেরার পরও বেশ কিছুদিন 'বোস খান্দান্'এর ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি চলল। যেন আমরা ছোট ছোট নেতা বা হিরো হয়ে গিয়েছি। ব্যাপারটা আমার বেশ অস্বস্তিকর লাগছিল।

সেই সময় আমার বাবা আমাকে আলাদা ডেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমত তিনি আমাকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আমাদের নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে তাতে যেন আমি প্রভাবিত বা বিভ্রান্ত না হই। তিনি বলেছিলেন যে আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে গৌরবের অধিকারী হয়েছি সেটা বাস্তবিকপক্ষে 'সুভাষের reflected glory'। আমার পক্ষে উচিত হবে ডাক্তারি পড়া শেষ করার দিকে মন দেওয়া এবং সাধারণভাবে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তিনি অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে জনজীবনে নিজের স্থান করে নেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেটা অর্জন করতে হবে নিজের কাজ ও অবদানের মধ্য দিয়ে।

বাবার দ্বিতীয় পরামর্শ ছিল যে আমি যেন বিগত পাঁচ বছরের আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেলি। অবশ্যই ঐ লেখার প্রধান অঙ্গ হবে রাঙাকাকাবাবুর গোপন গৃহত্যাগ ও আমার বৈচিত্র্যময় কারাজীবনের কাহিনী। তিনি পরিষ্কার করে বলেননি লেখাটি নিয়ে তখন আমরা কি করব, যদিও মাকে দিয়ে প্রায়ই এবিষয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিতেন।

বাবার প্রথম পরামর্শমত আমি ডাক্তারি পড়ায় ফিরে গেলাম। অবশ্য দেশসেবার প্রস্তুতি হিসাবে বাবার সমর্থনেই নানাধরনের জনহিতকর কাজেও আমি অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। চল্লিশ দশকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পাঁচ বছরের কাহিনী লেখার ব্যাপারে বাবার কথা সেই সময় আমি রাখতে পারিনি। তবে যাতে ভুলে না যাই, গত তিন দশক ধরে সম্পূর্ণ কাহিনীটি আমি অসংখ্যবার মনে মনে নিজেকে শুনিয়েছি।

১৯৫০-এ যখন বাবার মৃত্যু হল তখনও আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। তারপর অনেক ভেবেছি, ঐতিহাসিক যে সব তথ্য নিতান্তই আমার নিজস্ব হয়ে রয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার কি করা উচিত। দেশ-এ 'মহানিষ্ক্রমণ' প্রকাশিত হবার পর অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন আমি এতদিন ঐ কাহিনী প্রকাশ করিনি। বাবার সতর্কবাণীর কথা ত আগেই বলেছি। বিলম্বের আরও সুচিন্তিত কারণ আছে। আমি বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলাম যে রাঙা-কাকাবাবুর গৃহত্যাগে আমার সামান্য ভূমিকা কিছুকাল আমার মনপ্রাণ সম্পূর্ণ-ভাবে অধিকার করলেও তাঁর বিরাট জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে সেটি অন্যতম। সুতরাং আত্মপ্রচারের ইচ্ছা আমার না থাকলে কাহিনীটি প্রকাশের বিশেষ কোন তাড়া নেই। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে রাঙা-কাকাবাবুর সম্পূর্ণ জীবনকথা লিপিবদ্ধ করার ও তাঁর জীবন নিয়ে চর্চা ও গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁর মহানিষ্ক্রমণের কাহিনী নিবেদন করব। শেষ পর্যন্ত সেই পথের সন্ধান আমি পেলাম নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর মধ্যে এবং স্থির করলাম যে ব্যুরোর কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করব।

পনের বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ১৯৭০ সালে নেতাজী ও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করলেন। সেই সম্মেলনের জন্য আমি নেতাজীর ঐতিহাসিক গৃহত্যাগের বিবরণ লিখলাম। খবর পেয়ে বন্ধুবর শ্রীসাগরময় ঘোষ আমাকে ধরলেন যে, বাংলায় আরও বিশদভাবে কাহিনীটি 'দেশ' পত্রিকার জন্য লিখতে হবে। সাগরবাবুর উৎসাহ না পেলে লেখাটি হত কিনা সন্দেহ। লেখাটি করতে হল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিক থেকে এক বিশেষ দুঃসময়ের মধ্যে। সহধর্মিণী পাশে না থাকলে কাজটি করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

দেশ-এ লেখাটি বেরোবার পর আমি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করেছি এবং আমার বিশ্বাস যে কাহিনীটি এখন মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। পাঠক মনে রাখবেন যে এটা রহস্যের বা রোমাঞ্চের কাহিনী নয়। ভারতের ভবিষ্যত ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ এক চিরন্তন প্রেরণা, মুক্তিযজ্ঞে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ সহযোগী ও কাহিনীকার হিসাবে আমি এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য মাত্র।

বসুধরা
১০ শরৎ বসু রোড
কলিকাতা ৭০০০২৬
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

শিশিরকুমার বসু

No.IV/4/43-M.S.
GOVERNMENT OF INDIA.
HOME DEPARTMENT.

New Delhi, the 7th November, 1944.

Notice under section 7 of the Restriction and Detention Ordinance, 1944 (III of 1944)..

In pursuance of Section 7 of Ordinance No.III of 1944, you Sisir Bose are informed that the grounds for your detention are that you were acting in a manner prejudicial to the defence of British India inasmuch as in collaboration with members of the Bengal Volunteer

2. You are informed that you have a right to make a representation in writing against the order under which you are detained. If you wish to make such a representation you should address it to the undersigned and forward it through the officer-in-charge in whose custody you have been placed as soon as possible.

Sd/ R.Tottenham.

Additional Secretary to the Government of India.

সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার অভিযোগ করে লাহোর ফোর্টে লেখককে এই চার্জসীট দেওয়া হয়েছিল।

লাহোর ফোর্ট, ১৯৪৪ সালের নভেম্বর। প্রায় দু' মাস নিঃসঙ্গ ও বিভীষিকাময় কারাবাসের পর আমার সেলের দরজা খোলা হল। পিছমোড়া করে হাতকড়া লাগিয়ে ফোর্টের কর্তৃপক্ষ দিল্লী থেকে আগত দুই উচ্চপদস্থ ইংরাজ অফিসারের সামনে আমাকে হাজির করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে নানারকম রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করে শেষে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তোমার কাকার দেশত্যাগের আগে তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই না? প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে আমি একটু ঘুরিয়ে জবাব দিলাম—যে-কোন ভারতীয় পরিবারে কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক সাধারণত ঘনিষ্ঠই হয়ে থাকে। শুনে আমার প্রশ্নকর্তা চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন। তার পরেই আমাকে একটি চার্জশীট দেওয়া হল।

নেতাজী যখন ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে দেশত্যাগ করবার বিরাট সিদ্ধান্ত নিলেন, তারই পটভূমিকায় আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা একটু অপ্রত্যাশিতভাবে গড়ে উঠেছিল। তাঁর বেশ বিরাট ভাইপো-ভাইঝি পরিধির মধ্যে আর বিশেষ করে আমার ভাই-বোনদের কাছে আমাদের রাঙাকাকাবাবুর বরাবরই একটি বিশেষ স্থান ছিল। আমার বাবা ও মা—শরৎচন্দ্র ও বিভাবতী, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সুভাষচন্দ্রকে যে চোখে দেখতেন এবং যে-কোনও পরিস্থিতিতে যে বিশেষ স্নেহ-প্রশ্রয় দিতেন, তার ফলে আমাদের মনে তাঁর প্রতি একটা বিশেষ পক্ষপাত সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এ ছাড়াও রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত চরিত্র-মাধুর্য ও তাঁর ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিদের খেলার সাথী হয়ে তাদের সব ছেলেমানুষিতে হাসিমুখে যোগ দিতে পারার আশ্চর্য ক্ষমতা এই পক্ষপাতের অন্যতম কারণ ছিল। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বাবা মার উৎসাহ ও দৃষ্টান্ত এবং রাঙাকাকাবাবুর আকর্ষণীয়

ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমার মনের সভয় শ্রদ্ধা ও নিজের ভীরু-স্বভাবের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ মাখামাখির ভাব কখনোই সম্ভব হয়নি। পরিবারের আর সকলে, এমনকি বাইরের লোকও খুব সহজেই যা করতে পারত, তা আমার দ্বারা সম্ভব হত না। বোধহয় নিজের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য আমি নিজেকে এই বলে বোঝাতাম যে, এরকম একজন অতি অসাধারণ ও দুর্লভ ব্যক্তির সঙ্গে কাকা-ভাইপোর সাধারণ অন্তরঙ্গতার কোন স্থান নেই।

পরিবারের পরবর্তী জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ওঁর উৎসাহ ছিল গভীর—তা তাদের চরিত্র ও রুচি যার যেমনই হোক না কেন। বিশেষ করে আমার ভাইবোনেদের ক্ষেত্রে রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতানুসারেই আমাদের বাবা-মা আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক করতেন—যেমন ছবি আঁকার ব্যবস্থা, সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখানোর জন্যে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি। আমার অন্তর্মুখিতা ভেদ করার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একেবারে শেষ সময়ের আগে সক্ষম হননি। তিনি আমাকে "দি সাইলেন্ট বয়" উপাধি দিয়েছিলেন এবং বলতেন, আমি নাকি শুধু monosyllable-এ কথা বলি আর যতই খোঁচাখুঁচি করা হোক না কেন, কেবল নিঃশব্দে মাথা নাড়ি ও হাসি। এইরকম অবস্থাই অনেক দিন ধরে চলেছিল, যদিও আমি নিজের মনে বালক-বয়স থেকেই ওঁর জীবন ও কর্মধারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতাম। আমার বিশ্বাস তিনি এ কথা জানতেন।

রাঙাকাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার যে প্রথম স্মৃতি, তার সঙ্গে ১৯৪০-৪১ সালের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের ঐতিহাসিক দিনগুলির এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। সেটা ছিল বহু দিন আগে ১৯২৭ সালের কথা, উনি বর্মার বন্দিদশা থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমি তখন নেহাতই বালক, তাঁর বিছানার পাশে বসে আমি অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে, ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে

থাকতাম, আমার মনে হত যেন এক যোগী পুরুষ আমাদের পরিবারের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৯৪০ সালে আবার ওঁর অসুস্থ শয্যাপার্শ্বে বসে রাতের পর রাত ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত, কী যেন এক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এ যেন জীবন্ত বিপ্লবের ছবি, আদর্শের বেদীমূলে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের এক অতুলনীয় মূর্তি।

যখনকার ঘটনা বলছি, ১৯২৭ সাল, তখন আমরা আমাদের বাবা-মা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বর্তমান নেতাজী ভবনের পাশেই, ৩৮।১ এলগিন রোডে ভাড়া-বাড়িতে বাস করি। ১৯২৮ সালে বাবা ১নং উডবার্ন পার্কে বাড়ি করলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাদের সঙ্গে উডবার্ন পার্কে বাস করতে লাগলেন। ১৯৩২ সালে তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রবাসে বা অন্তরীণে কাটল। বাবা মার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ছেদ পড়ল না। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পাবার পর তাঁর মা, আমাদের মা জননী প্রভাবতীর ইচ্ছানুসারে তিনি আমাদের সাবেক বাড়ি ৩৮।২ এলগিন রোডে বাস করতে লাগলেন। দুই বাড়ির—১নং উডবার্ন পার্ক ও ৩৮।২ এলগিন রোড—দূরত্ব খুবই কম, তিন মিনিটের পথ।

এই সঙ্গে আর একটি স্মৃতিও তাৎপর্যপূর্ণ। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড ১৯২৭ সালে শিলং-এর শৈলনিবাসে লুকোচুরি খেলা। আমাদের ভাইবোনদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াতেন এবং আমরা সকলে মিলে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করতাম। খেলার সময় তিনি প্রায়ই ক্লান্ত হবার ভান করে শুয়ে পড়তেন এবং হঠাৎ ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। যে বিরাট লুকোচুরি খেলায় আমি পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গী হলাম, তাতে তফাতটা হল, আমি তাঁর পক্ষে, বিপক্ষে নয়।

১৯২৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ এই কাহিনীর জন্য

দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাহচর্য ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল, তার একটা আভাস হয়ত দিতে পারি। আমার মা'র হাত ধরেই রাঙাকাকাবাবুর রাজনৈতিক অথবা জনসেবার কাজের সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার প্রথম পরিচয়। মহিলা সভায়, স্বদেশী যাত্রায়, ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অথবা সেবাকার্যের সাহায্যে নানারকম অনুষ্ঠানে আমি মা'র আঁচল ধরে রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা শুনতে যেতাম। সেই সময় তিনি শুদ্ধ বাংলায় ঠেকে ঠেকে দার্শনিকের মত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করতেন। বক্তৃতার অনেক কিছুই বুঝতাম না। তাঁর মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত কেবল তাকিয়ে থাকতাম।

১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় আমাদের কাছে রাঙাকাকাবাবুর এক নব-আবির্ভাব হল। সামরিক পোষাকে যখন তিনি উডবার্ন পার্কের সিঁড়ি দিয়ে নামতেন, সে দৃশ্য কোন অবোধ বালকের কাছেও অপূর্ব ও অবিস্মরণীয়! দুপুরে কাজের অবসরে বাড়ি ফিরতেন; রোদে-পোড়া মুখ টকটকে লাল। দোতলার মাঝের ঘরে ইউনিফরমের জ্যাকেট ও বেল্ট পালঙ্কের উপর ছুঁড়ে ফেলে বিশ্রাম নিতেন এবং মা তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। বালক বা বৃদ্ধ, এ ছবি যাঁরা দেখেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের রূপ তাঁদের কাছে অভূতপূর্ব নয়।

তাঁর দেশত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৮-৩৯ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। সেই সময় আমি রাজনীতিতে সত্যিকারের উৎসাহ নিতে আরম্ভ করেছি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াশুনাও আরম্ভ করেছি। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস থেকে ফিরে রাঙাকাকাবাবু আমাকে একটা আপাতদৃষ্টিতে সরল অথচ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ কাজের ভার দিলেন। এর ফলে যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি হল। উনি আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, আমি যেন নিয়মিত মস্কো রেডিও শুনি। বিশেষত ভারতীয় ঘটনাবলী ও আমাদের জাতীয় আন্দোলন

সম্পর্কে ওরা কি বলে বা কিভাবে রিপোর্ট করে তা নজর করি এবং ওদের প্রচারের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ওঁকে ওয়াকিবহাল রাখি। বহু দিন ধরে আমি মাঝ রাতে এবং ভোর রাতে মস্কো রেডিওর অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার শুনতাম। প্রায়ই রেডিওর উপরেই ঘুমিয়ে পড়তাম। বাবা এসে আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং সুভাষের পাল্লায় পড়েছি বলে রসিকতা করতেন। দুঃখের বিষয়, সেই সূত্র থেকে কৌতূহলোদ্দীপক বা উৎসাহব্যঞ্জক বিশেষ কিছু আমি শুনিনি এবং রাঙাকাকাবাবুকেও জানাতে পারিনি।

॥ ২ ॥

১৯৪০-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসে রাঙাকাকাবাবু যখন শেষবারের মত জেলে ছিলেন, তখন আমি পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েছি। আমার মনে আছে, উনি আমাকে মেডিকেল কলেজে আমার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে খোঁজখবর করতেন, আর আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন যে, হাফ্-ডাক্তার হওয়ার চাইতে হাফ্-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভাল। উনি অন্যান্যদের সম্বন্ধেও একই-ভাবে খোঁজখবর করতেন। জেলের কর্তাদের নিয়ে ওঁর যে সব রসিকতা ছিল তা আমরা খুব উপভোগ করতাম। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কতদিন?" বার বার এই প্রশ্ন করে তিনি জেলের ভারতীয় কর্মচারীদের অপ্রস্তুত করে দিতেন। তারপর তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলতেন যে, তাঁদের চাকরি বহাল থাকবে। কেবল আজ যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন আর যাঁরা বন্দী, তাঁদের মধ্যে স্থান বিনিময় হবে।

অক্টোবর মাসে সহবন্দীদের নিয়ে নেতাজী জেলের মধ্যে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন। তাতে আমাদের খুব উৎসাহ। বিসর্জনের দিন জেল-গেটের কাছে প্রতিমা নেবার জন্য যে ...

গেল আমি তাদের সঙ্গে জুটে পড়লাম।

আমার বাবা তাঁর বন্দী ভ্রাতার কাছে প্রায়ই যেতেন। এই সময় আমি মা'র কাছে শুনি যে, তিনি বাবাকে খুব পীড়াপীড়ি করছেন যে, উনি যখন পূজার সময় উত্তর ভারতে বেড়াতে যাবেন, তখন যেন সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবর শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মিয়াসাহেবকে সোভিয়েট রাশিয়া যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখনই শুনেছিলাম যে, প্রথম জীবনে মিয়া আকবর শাহের এই ধরনের ভ্রমণের আরো অভিজ্ঞতা আছে।

২৯শে নভেম্বর থেকে রাঙাকাকাবাবু যখন জেলে অনশন শুরু করলেন, তখন সপ্তাহখানেক আমাদের সমস্ত পরিবারে একটা চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিল। আমার বাবা তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলের নেতা। আবার মা'র কাছে শুনলাম যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাবাকে বলেছেন যে, ব্রিটিশ প্রভুরা এ ব্যাপারে খুব কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবে। তাতে আমাদের দুশ্চিন্তা গভীরতর হল। কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর বিকেলবেলা আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে খবর এল যে, রাঙাকাকাবাবু বিনাশর্তে মুক্তি পেয়েছেন ও তাঁকে একটি অ্যামবুলেন্স-এ করে বাড়িতে আনা হয়েছে।

আমরা যারা তখন বাড়িতে ছিলাম (উডবার্ন পার্ক) সকলে তাঁকে দেখতে এলগিন রোডের বাড়িতে ছুটলাম। রাঙাকাকাবাবু তাঁর ঘরে শুয়ে ছিলেন এবং তাঁকে খুব দুর্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

এইখানে বলে রাখি যে, নেতাজীর ঘর বলে আজ যেটি সকলের পরিচিত, সেটি ছিল আসলে তাঁর বাবা জানকীনাথের ঘর। রাঙাকাকাবাবু যখন ১৯৩৭ সালে এলগিন রোডের বাড়িতে বাস করতে আসেন, তার বছর দুয়েক আগে জানকীনাথের মৃত্যু হয়েছে। ঘরে দুটি খাট আছে—জানকীনাথের পুরানো সাবেকী ধরনের বড় খাট ও অন্যটি একটি মোটামুটি সাধারণ তক্তাপোশ। রাঙাকাকাবাবু সাধারণ খাটটি ব্যবহার করতেন।

জেলে উনি গোঁফ রেখেছিলেন। তাতে যেন তাঁকে আরও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ঘরে কেউ ঢুকলেই তিনি তাঁর স্বভাবমত হেসে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। আমি আমার স্বভাবমত সলজ্জভাবে ওঁর কাছে গেলাম, আমার হাতখানা ওঁর নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘক্ষণ দৃঢ়ভাবে তিনি ধরে রাখলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। পরে আমার মনে হয়েছিল, সেই দীর্ঘ ও হৃদয়স্পর্শী হাতধরা থেকেই হয়ত আমার সঙ্গে ওঁর নতুন সম্পর্কের সূচনা। অবশ্য এ-সবই আমার কল্পনা হতে পারে।

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও তার পরের ক'দিন বড় বেশী অতিথির ভিড় হতে লাগল। আমি দূরেই সরে রইলাম। আমার মা প্রতিদিন তাঁকে দেখতে যেতেন। মা এসে বলতেন, রাঙাকাকাবাবু আমার মেডিকেল কলেজের রুটিন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর করছিলেন। আমি কখন কলেজে যাই, কখন ফিরি, পড়াশুনার চাপ কেমন, ইত্যাদি। অবশ্য ওঁর যে আমার সঙ্গে বিশেষ কোন দরকার এমন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত তার মধ্যে ছিল না। তিনি মাকে সোজাসুজি বলেনওনি যে, আমার সঙ্গে ওঁর বিশেষ কোন কাজ আছে বা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

॥ ৩ ॥

সেদিন ছিল ছুটির দিন। দুপুরে খাওয়ার সময় নেতাজীর নিজস্ব ভৃত্য উডবার্ন পার্কে আমার কাছে এসে খবর দিল, রাঙাকাকাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, সেদিনই যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি। কিছুক্ষণ পরে আমি এলগিন রোডের বাড়িতে উপস্থিত হলাম ও বুঝতে পারলাম রাঙাকাকাবাবু আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঢুকতে ঘরটা খালি করিয়ে নিলেন। ওঁকে

শুধু অল্প একটু আগাছার মত গজানো দাড়িটা কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল। খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে তিনি বসে ছিলেন। ওঁর শান্ত ও স্বাভাবিক চেহারা দেখে আমার একবারও মনে হয়নি যে, কোন গুরুতর কথার তিনি অবতারণা করবেন। আমার অভ্যাসমত একটু দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আমি ওঁর বাবার যে খাটটি ছিল তার উপর বসতে গেলাম। আমাকে ইশারা করে ঘুরে এসে ওঁর নিজের বিছানার উপর ডান দিকে বসতে বললেন, তাই বসলাম। এই কাছে ডাকাতেই আমি যে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম তা বলাই বাহুল্য।

কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর—'আমার একটা কাজ করতে পারবে?' এই বলে তিনি শুরু করলেন। আমার যেমন স্বভাব, একটু দুর্বল ও দ্বিধান্বিতভাবে মাথা নাড়লাম। 'তুমি কেমন গাড়ি চালাতে পারো?' 'এই একরকম মোটামুটি ভালই পারি।'—বললাম। রাঙাকাকাবাবু আর একটু বিশদ হলেন—'কখনো লঙ ডিসট্যান্স গাড়ি চালিয়েছ?' আমি বললাম—'না'। 'দেখ, একদিন রাত্রে তোমাকে গাড়ি করে আমাকে বেশ কিছু দূরে পৌঁছে দিতে হবে। কেউ কিন্তু জানবে না।' আমি নির্লিপ্ত মুখে শুনে যাচ্ছিলাম। 'পারবে?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম। এই মাথা নাড়ার মানে 'হ্যাঁ'-ও হতে পারে আবার অনিশ্চিতও হতে পারে। উনি যেন 'হ্যাঁ' বলে ধরে নিলেন এবং আরও বলে চললেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে প্ল্যান করতে হবে যে, সব কিছু যেন ফুল-প্রুফ হয়। অবশ্যই আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রাণীকেও কিছু বলতে পারব না।

রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তিনি গোপনে, গৃহত্যাগ করে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছেন—এলগিন রোডের বাড়িতে সে কথা জানবে একমাত্র ইলা। ইলা আমার খুড়তুতো বোন, আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, ইলাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, আর তাঁর বিশ্বাস যে, সে পারবে।

এই প্রথম সাক্ষাৎকার শেষ হলে তিনি বললেন বাড়ি গিয়ে এই পরিকল্পনার সব দিক ভাল করে খতিয়ে দেখতে এবং পরদিন সন্ধ্যায় এসে এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত দিতে। বারবার উনি বললেন, এই প্ল্যান ফুল-প্রুফ হওয়া চাই। কোন ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।

কিছু বিস্ময় ও চাপা উত্তেজনা মনের মধ্যে নিয়ে আমি ১নং উডবার্ন পার্কে হেঁটে ফিরলাম। ব্যাপারটি কী? আমার প্রথম মনে হয়েছিল, উনি হয়ত গোপনে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, আমায় তাঁকে সেখানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করতে হবে।

॥ ৪ ॥

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার মনের মধ্যে এই উপলব্ধি হলো যে, আমার এতদিনকার নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা অসাধারণ ও চ্যালেঞ্জিং কিছু ঘটতে চলেছে। এও বুঝলাম যে, আমার দিক থেকে যে সংকোচ এতদিন আমার ও রাঙাকাকাবাবুর সম্পর্কের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে এসেছে তা আমাকে এবার কাটিয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময়ে রাঙাকাকাবাবুর আহ্বানে শয্যা-পার্শ্বে গিয়ে বসতে আমি আর ইতস্ততঃ করলাম না। সেদিন থেকে শুরু করে প্রতি দিন ওঁর বিছানার বাঁ দিকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যান নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনা যত অগ্রসর হল, পরিকল্পনা যখন দানা বাঁধতে শুরু করল, তখন আমি উঠে বারান্দার দিকের দরজাটা প্রায়ই বন্ধ করে দিয়ে আসতাম, যাতে চট করে কোন আত্মীয়-পরিজন ঢুকে না পড়ে। মাজননীর ঘরের দিকের অন্য দরজাটি অবশ্য বরাবরই বন্ধ থাকত।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি যখন তাঁর কাছে ফিরে গেলাম তখনও আমার মনে কোন সুচিন্তিত মতামত গড়ে ওঠেনি। তার কারণ প্রথম দিন প্ল্যান সম্বন্ধে উনি যেটুকু বলেছিলেন তা যথেষ্ট ছিল না। সাহস সঞ্চয় করে ওঁর মুখোমুখি হলাম। এবার থেকে শুরু হল প্রতি দিনের দেখাসাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎগুলো খুব সহজ ও স্বাভাবিক দেখানো দরকার। অনেক সময় আমাকে ঘোরাফেরা করে বেড়াতে হত যতক্ষণ না বাইরের অতিথিরা উঠে যান। ঘরে যদি আত্মীয়স্বজন বা ভৃত্যরা কেউ থাকত তা হলে অপেক্ষা করে থাকতে হত, রেডিওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম কিংবা আর কোন তুচ্ছ কাজ। অসুস্থ কাকাকে ভাইপো দেখতে আসবে এতে অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, তবুও রাঙাকাকাবাবু ভেবেচিন্তে একটা অজুহাত বার করলেন, কেউ প্রশ্ন করলে বলা হবে যে, আমি রেডিওটা ভাল চালাতে পারি তাই ওঁকে ফরেন ব্রডকাস্টগুলো শুনতে সাহায্য করি। অবশ্য উনি সত্যিই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি খুঁটিয়ে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এবং বার্লিন, রোম ও লণ্ডনের সংবাদ প্রচার ও ভাষ্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুনতেন।

আমরা ওঁর পরিস্থিতির মূল্যায়ন মন দিয়ে শুনতাম, যুদ্ধে অথবা কূটনীতিতে ইংরেজ কোন বেকায়দায় পড়েছে শুনলে উনি সত্যিকারের আনন্দ পেতেন, আমরাও সেই আনন্দের ভাগী হতাম।

আমাদের আলোচনা যত অগ্রসর হতে লাগল, আমার আত্মবিশ্বাসও ততই বাড়তে লাগল। আমার এই নবলব্ধ সাহসের ফলে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, আমি রাঙাকাকাবাবুর কোন কোন প্রস্তাবের সমালোচনা বা বিরোধিতা করছি। ধীরে ধীরে তাঁর সম্বন্ধে আমার সংকোচের প্রাচীর একেবারে ভেঙে গেল।

১৯৪১ সালের গোপন যাত্রার পরিকল্পনার সময় রাঙাকাকাবাবুর আর এক বিদেশ যাত্রার কথা আমার প্রায়ই মনে হত। ১৯৩৩ সালের গোড়ার কথা। জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলে দুই

ভাই তখন একসঙ্গে বন্দী। রাঙাকাকাবাবু রোগে শয্যাশায়ী —চিকিৎসার জন্য সরকার তাঁকে ইউরোপ যেতে অনুমতি দিয়েছেন। আমরা কয়েকজন মা ও আমাদের ঠাকুমা'র (বাসন্তী দেবী) সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিতে গিয়েছি। সে আর এক ধরনের যাত্রা। জেল থেকে কড়া পুলিশ পাহারায় অ্যাম্বুলেন্স করে তাঁকে ষ্টেশনে নিয়ে গেল, সেখানে ষ্ট্রেচারে করেই তাঁকে ট্রেনের কামরায় তুলে দিল। জেলের মধ্যে বাবার কাছে বিদায় নেবার সময় রাঙা-কাকাবাবু ভেঙ্গে পড়লেন—বাবার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদলেন। বোম্বাই থেকে তাঁকে জাহাজে তুলে দেবে এবং জাহাজ ভারতের কূল ছেড়ে যাবার পর তিনি মুক্ত হবেন। অনুশাসনের আর শেষ নেই! ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১! ব্রিটিশ সরকারের সব বাধা-নিষেধ তুচ্ছ করে ও সব অনুশাসন অগ্রাহ্য করে কি প্রতিশোধই না ১৯৪১এ নেওয়া গেল! কেবল ১৯৪১ সালের গোপন যাত্রার আগে বাবার কাছ থেকে রাঙাকাকাবাবু কি ভাবে বিদায় নিয়েছিলেন সেটা জানতে পারলাম না।

রাতের পর রাত রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবার সময় আর একবার ১৯৩৬ সালে কারসিয়ং-এ তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে যে দিনগুলি কাটিয়েছিলাম তার কথাও আমার মনে পড়ত। সে-সময় খুব কাছ থেকে তাঁর অনেক কথাবার্তা শোনবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। চার বছর ইউরোপে নির্বাসনের পর তিনি দেশে ফেরামাত্র সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করল এবং বাবার কারসিয়ং-এর বাড়িতে বন্দী করে রাখল। সেই সময় আমার দাদা অমিয়নাথ ও আমি গরমের ছুটিটা রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কারসিয়ং-এ কাটাবার অনুমতি পেলাম। আমি সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং বোধকরি খানিকটা ভাবতে ও বুঝতে শিখেছি। কথাবার্তা অবশ্য প্রায় সবই হত রাঙাকাকাবাবু ও আমার দাদা অমিয়নাথের মধ্যে এবং আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা। সকাল থেকে আরম্ভ করে বেশ রাত পর্যন্ত, এমন কি ঘোর বর্ষার মধ্যে বেড়াতে বেড়াতেও রাঙাকাকাবাবু কথাবার্তা চালাতেন। বিষয়ের

কোন সীমা ছিল না। পারিবারিক খুঁটিনাটি ব্যাপার, নিজের জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে দেশ-বিদেশের রাজনীতি, interpretation of dreams পর্যন্ত। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণে আমার আগ্রহ ছিল বেশী, কারণ সেই বয়সে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নিতে পারতাম। আমাদের দিকে একটু চেয়ে খানিকটা দুঃখের সুরে হয়ত বললেন, জানো, আমি যখন তোমাদের বয়সী বা আরও ছোট, বাড়িতে আমাকে বিশেষ কেউই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না—প্রায় সকলেই বলতেন যে ওটা একটা বদ্ধ পাগল। জীবনে ওর কিছুই হবে না। একটু পরেই হয়ত বিষয়টা সম্পূর্ণ বদলে নিয়ে যেন ভবিষ্যতের একটু আভাস দিয়ে বললেন—লেনিনের একটা গল্প শোন। এই যেমন আমরা বেড়াচ্ছি, লেনিন তাঁর সাথীদের নিয়ে লণ্ডনের রাস্তায় যখন বেড়াতে বের হতেন, লণ্ডনের "ববি"রা (পুলিশ কনষ্টেবল) তাঁকে দেখিয়ে পরিহাস করে বলত—দেখ দেখ, ঐ লোকটির নাম হল লেনিন, ওরা আমাদের দেশে ইঁদুরের গর্তের মধ্যে লুকিয়ে বাস করে, আবার কিনা ওরা প্রবল পরাক্রান্ত জারকে উচ্ছেদ করার স্বপ্ন দেখে। বলেই রাঙাকাকাবাবু হাসলেন। অনেক পরে বুঝলাম যে, তাঁর বিরাট স্বপ্নের ইঙ্গিত তিনি ঐ গল্পের মধ্যে দিয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

আমাদের এই গোপন শলাপরামর্শ শুরু হবার অল্প ক'দিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু একদিন আমাকে খুব শান্তভাবে একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। উনি জানতে চাইলেন, যে কাজের ভার উনি আমাকে দিচ্ছেন তা আমি বাবা-মাকে না জানিয়ে করতে পারব কিনা। আমার কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তি বোধ হল তারপর মৃদু গলায় বললাম, 'ঠিক আছে।' কিছু দিনের মধ্যেই অবশ্য

আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য ঐ প্রশ্নটি করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত আমাকে তখনই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি। বাবার শরীরটা কিছু দিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না বলে বাবা সবেমাত্র তিন সপ্তাহের ছুটিতে কালিম্পং চলে গিয়েছেন। মা-ও ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার বড়দাদার কাছে বারারিতে (ধানবাদের কাছে) বড়দিনের ছুটি কাটাতে চলেছেন।

বাবার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তাঁর 'মেজদা' জীবনে কোনদিন তাঁর কোন কাজে বাধা দেননি। বরঞ্চ যে-কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার মুহূর্তে মেজদার কাছ থেকে উনি পেয়েছেন উৎসাহ ও সমর্থন। আজ যদি মেজদা তাঁর নিজের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্য ওর ছোট ভাইয়ের এই বিপদের পথে পাড়ি দেওয়া সমর্থন না করেন, তবে উনি কঠিন সমস্যায় পড়ে যাবেন। আমার মনে আছে, বাবা জানুয়ারির গোড়ায় কলকাতায় ফেরার আগে রাঙাকাকাবাবু দুই-তিনবার লেট-ফি দিয়ে কালিম্পং-এর ঠিকানায় শেয়ালদায় দার্জিলিং মেল ট্রেনে বাবাকে লেখা চিঠি পোস্ট করেছেন। পোস্ট অফিসের মারফত চিঠি না পাঠালে হয়ত সেন্সর এড়িয়ে যাওয়া যাবে এই মনে করেই সম্ভবত তিনি এরূপ করতেন।

বাবা-মা যত দিনে কলকাতায় ফিরলেন তত দিনে অন্তর্ধানের প্ল্যান অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং আমিও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছি। আমাকে আর বাবা-মাকে কিছু বলতে হল না। রাঙাকাকাবাবুই যা বলবার ওঁদের বললেন। ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে যে বিশেষ চিন্তিত বা বিচলিত হয়েছেন তা কিন্তু তাঁরা প্রকাশ করলেন না। তবে এই পরিকল্পনার মধ্যে যে বিপদের ঝুঁকি আছে সে সম্বন্ধে ওঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং এর সাফল্য সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু যতটা নিশ্চিত ছিলেন ওঁরা ততটা ছিলেন না।

বেশ কিছুকাল পরে ১৯৪২-এ আমি যখন ধরা পড়লাম তখন

বাবা সুদূর দাক্ষিণাত্যে জেলে বসে আমার বিপদের কথা ভেবে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আমি যখন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজবন্দী তখন জেল থেকে লুকিয়ে পাঠানো বাবার একখানা চিঠি আমার হাতে আসে। তাতে বাবা আমাকে অনেক চমকপ্রদ খবর দেন। বাবা জানতে পেরেছিলেন যে, ততদিনে নেতাজীর অন্তর্ধানে আমার ও মিয়া আকবর শাহের ভূমিকা ব্রিটিশ সরকার মোটামুটি সবই জেনে ফেলেছে। তাই সেই চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন যে, আমার অসুস্থতা বলতে গেলে শাপে বর হয়েছে, আমি সে সময় জেলে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। বাবা লিখলেন যে, তা না হলে আমাকে এত দিনে রেড ফোর্টে বা লাহোর ফোর্টে নিয়ে যাওয়া হত। আরো কিছুকাল পরে ১৯৪৪-৪৫এ বাবা যখন শুনলেন যে, আমাকে কোন অজ্ঞাতস্থানে বন্দী করে রাখা হয়েছে, উনি তখনই বুঝেছিলেন যে, আমাকে লাহোর ফোর্টে নেওয়া হয়েছে। সে সময় তাঁর জেল ডায়েরীতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে আমার জীবন-সংশয়ের কথা লেখা আছে। আর ১৯৪৪-৪৫ সালে যখন আমার কোন খবর দীর্ঘদিন পাওয়া যায়নি তখন আমার মা তো আমাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

॥ ৬ ॥

অল্প ক'দিন পরেই আমাদের যাত্রা ঠিক কি ধরনের হতে চলেছে সে সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু আমাকে আর একটু খুলে বললেন। প্রথমত উনি ছদ্মবেশ গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়ত, সীমান্ত প্রদেশ থেকে তিনি সংকেতের প্রতীক্ষা করছেন, সংকেত পেলে যাবার দিন স্থির হবে। উনি যে দেশত্যাগ করতে চলেছেন সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে গোপনে কিভাবে নিষ্ক্রান্ত হওয়া

যায় তাই হল আমাদের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। এই নিষ্ক্রমণের গোপনতা ও সাফল্যের উপরই অন্তর্ধানের পরবর্তী পর্যায়ের সফলতা নির্ভর করছে। সফল হলে ওঁর উপর পুলিশী প্রহরার ব্যর্থতা একটা উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবং ব্রিটিশ ইনটেলি-জেন্স অন্তর্ধানের সূত্র বার করতে হিমসিম খেয়ে যাবে।

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বার হবার নানারকম প্ল্যান প্রস্তাবিত হল ও সেগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও হল। শেষ পর্যন্ত একটা ফাইনাল প্ল্যান দাঁড় করানো গেল।

প্রথমে কথা হল উনি বেশ খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করবেন যে শরীর সারানোর জন্য উনি কলকাতা থেকে ষোল মাইল দূরে গঙ্গার ধারে রিষড়াতে আমার বাবার যে বাগানবাড়ি আছে সেখানে গিয়ে থাকবেন। তারপর আমি একদিন রাত্রে গোপনে ওঁকে ওখান থেকে মোটরে করে নিয়ে বর্ধমান বা আসানসোল পৌঁছে দেবো, তা যদি নাও হয়, যদি সোজা কলকাতা থেকে বর্ধমান যাওয়া হয় তবুও আমার পক্ষে রিষড়ায় একটা রাত কাটানো বেশ সুবিধাজনক হবে। এই পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রাঙাকাকাবাবু আমাকে বললেন, রিষড়ার বাড়ির মালীকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন গাড়ি চালিয়ে একটু রাত করে রিষড়ায় হাজির হয়ে রাতটা সেখানে কাটিয়ে আসতে। তা হলে অন্য কোন রাত্রে আমার হঠাৎ উপস্থিতিতে মালী আশ্চর্য হয়ে যাবে না, অভ্যস্ত থাকবে।

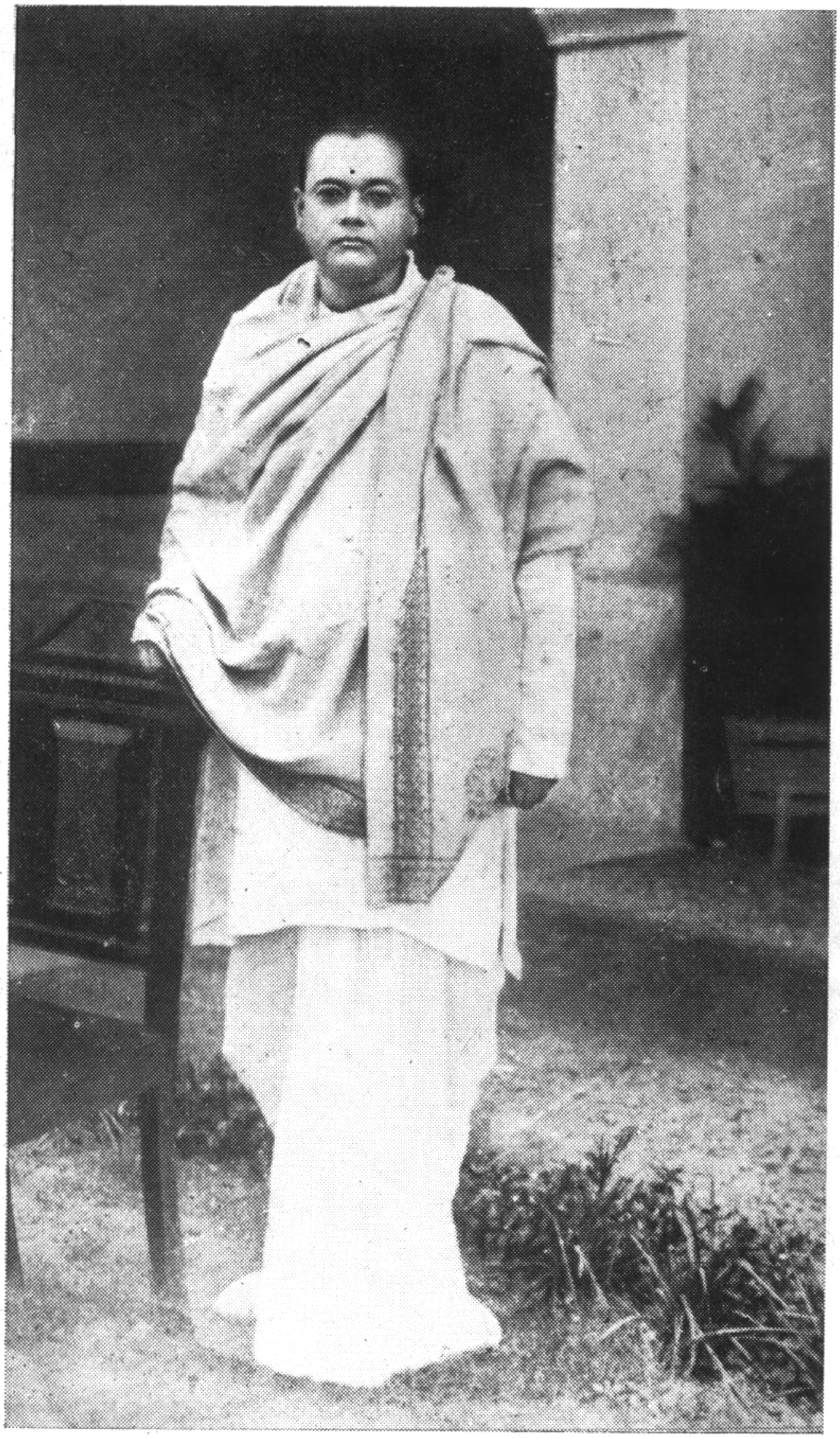
দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথমটিরই অনুরূপ, একটু অন্যরকম। কথা হল ঐরকম একটা ঘোষণা করে উনি রিষড়ায় নয়, এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে উঠবেন আর তিনতলায় ছাদের দিকের একটা ঘরে থাকবেন। অজুহাত হবে এই যে, শরীর সারানোর জন্য ওঁর যথেষ্ট আলো-হাওয়া দরকার, এলগিন রোডের বাড়িতে তা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি উডবার্ন পার্কে থাকেন তা হলে নিশ্চিন্ত মনে সব পরিকল্পনা করার সুবিধা হবে। উপরন্তু এতজন আত্মীয়-পরিজনের ও তাঁর বৃদ্ধা মার চোখে

ধুলো দেবার ব্যবস্থা করতে হবে না।

অবশ্য এই দুটো পরিকল্পনাই বাতিল করা হল. বাতিল করার কারণগুলো আমি উত্থাপন করেছিলাম বলে আমার ধারণা। প্রথম কারণ মনে হল—এতে করে পুলিশ জানতে পারবে, অন্তত এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাবার মত স্বাস্থ্যের উন্নতি তাঁর হয়েছে, ফলে, তারা আগের চেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর রাঙাকাকাবাবু আর ঘর থেকেই বার হচ্ছিলেন না। তার ফলে সকলের, বিশেষত পুলিশের, ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, উনি বড় রকমের সক্রিয় কোন কাজে হাত লাগাতে পারবেন না। এর ফলে শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেবার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। উডবার্ন পার্কে যাওয়ার বিপক্ষে আর একটা কারণ আমি দেখালাম—আমার বাবার বাড়িতে সব ব্যাপারে একটা কড়াকড়ি ও শৃঙ্খলা ছিল—যেমন প্রত্যেক গেটে লোক ছিল, দারোয়ান ঠিক সময়ে গেট বন্ধ করত, ইত্যাদি। অপরদিকে, এলগিন রোডের বাড়িতে সব কিছু ছিল ঢিলেঢালা, সেখানে যা খুশি তাই করে পার পাওয়া যেত।

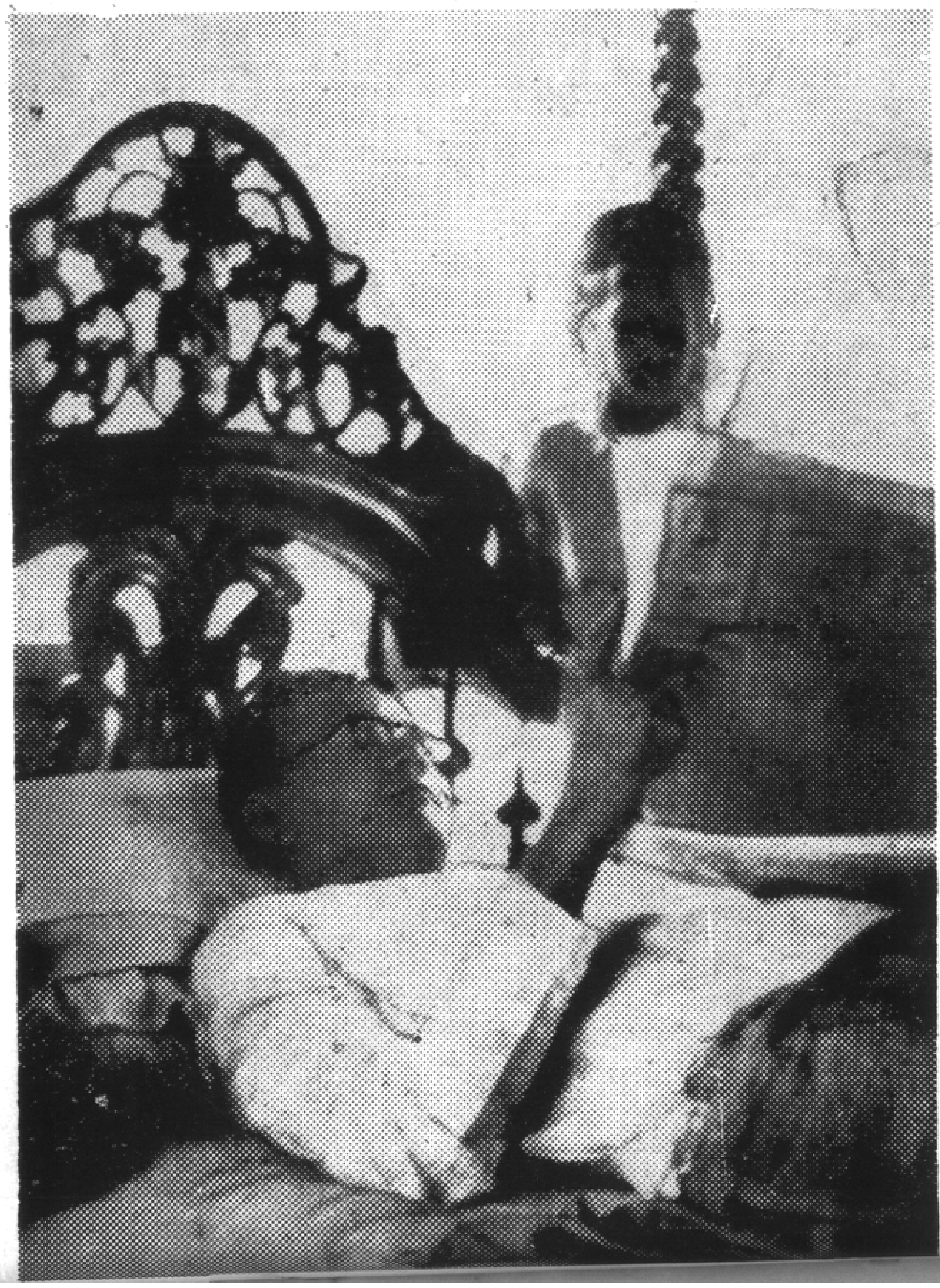
তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বিবেচনা করা হল। আমার বড়দাদা ডাঃ অশোকনাথ বসু ধানবাদের কাছে কাজ করতেন। তিনি মাঝে মাঝে নিজের মোটর গাড়িতে কলকাতায় আসতেন। প্রস্তাবটা হল—একবার কলকাতা থেকে ধানবাদ ফিরে যাবার সময় আমি রাঙাকাকাবাবুকে ওঁর গাড়িতে লুকিয়ে চাপিয়ে দিতে পারি। এই প্ল্যানটা বেশী দূর এগোল না: কারণ, তখন বাড়ির অন্যান্যরা দাদার কাছে গিয়েছেন এবং তাঁর কলকাতা আসার কোন কথাই নেই।

রিষড়া ও উডবার্ন পার্ক থেকে অন্তর্ধানের প্ল্যান পরিত্যক্ত হওয়ার পর আমরা আবার কিভাবে এলগিন রোডের বাড়ি থেকেই উধাও হওয়া যায় সেই পরামর্শ করতে লাগলাম। খুব সহজভাবে বাড়ির সদর গেট দিয়ে চালিয়ে যে বের হয়ে চলে যাওয়া সম্ভব এমনটি আমার মাথায় অনেকদিন আসেনি। তাই



উডবার্ন পার্কে সুভাষচন্দ্র (১৯২৯)







মাজননী প্রভাবতী বসু (১৯৩৮)

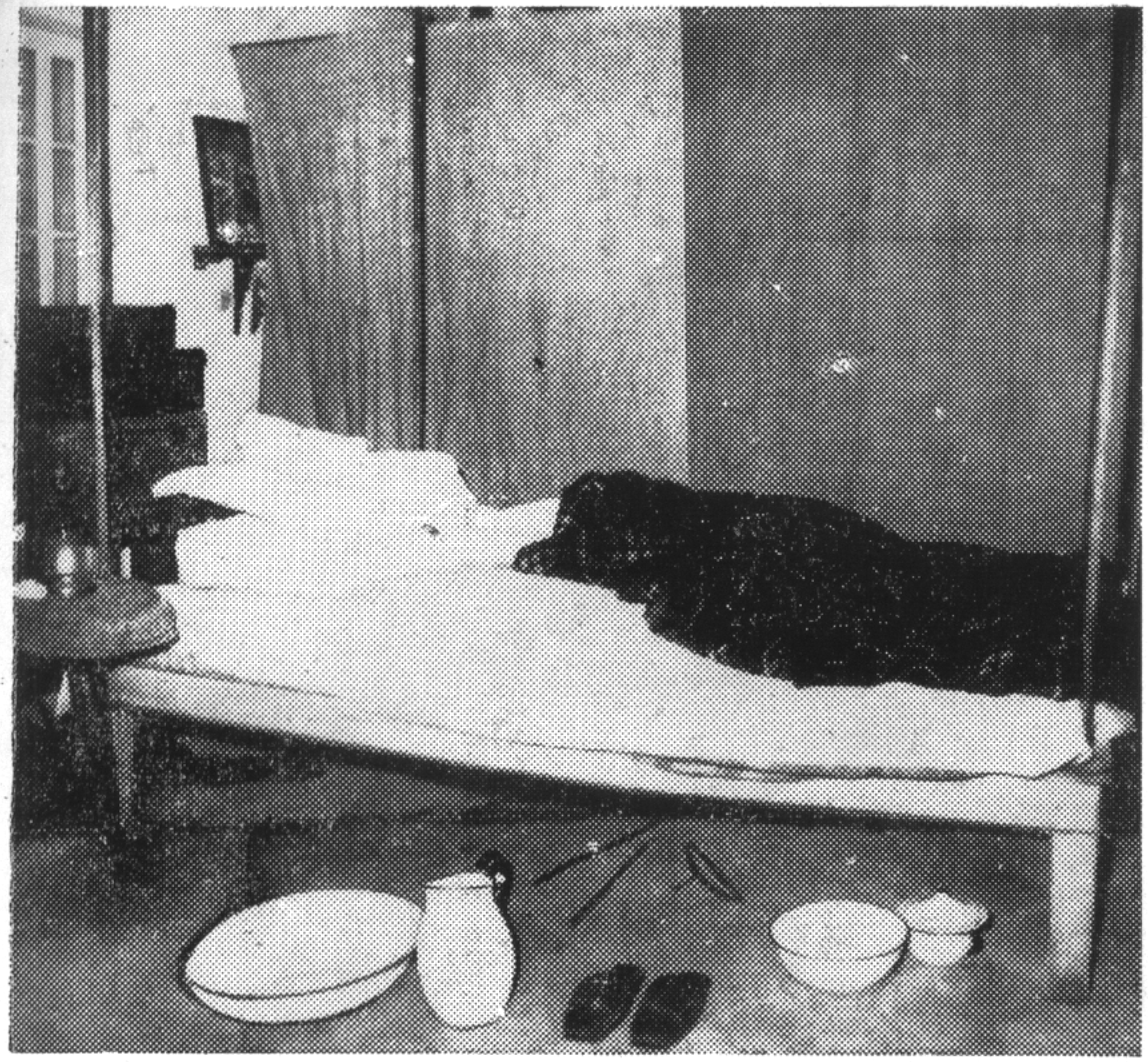


সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যেভাবে গাড়ীটি এলগিন রোডের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল

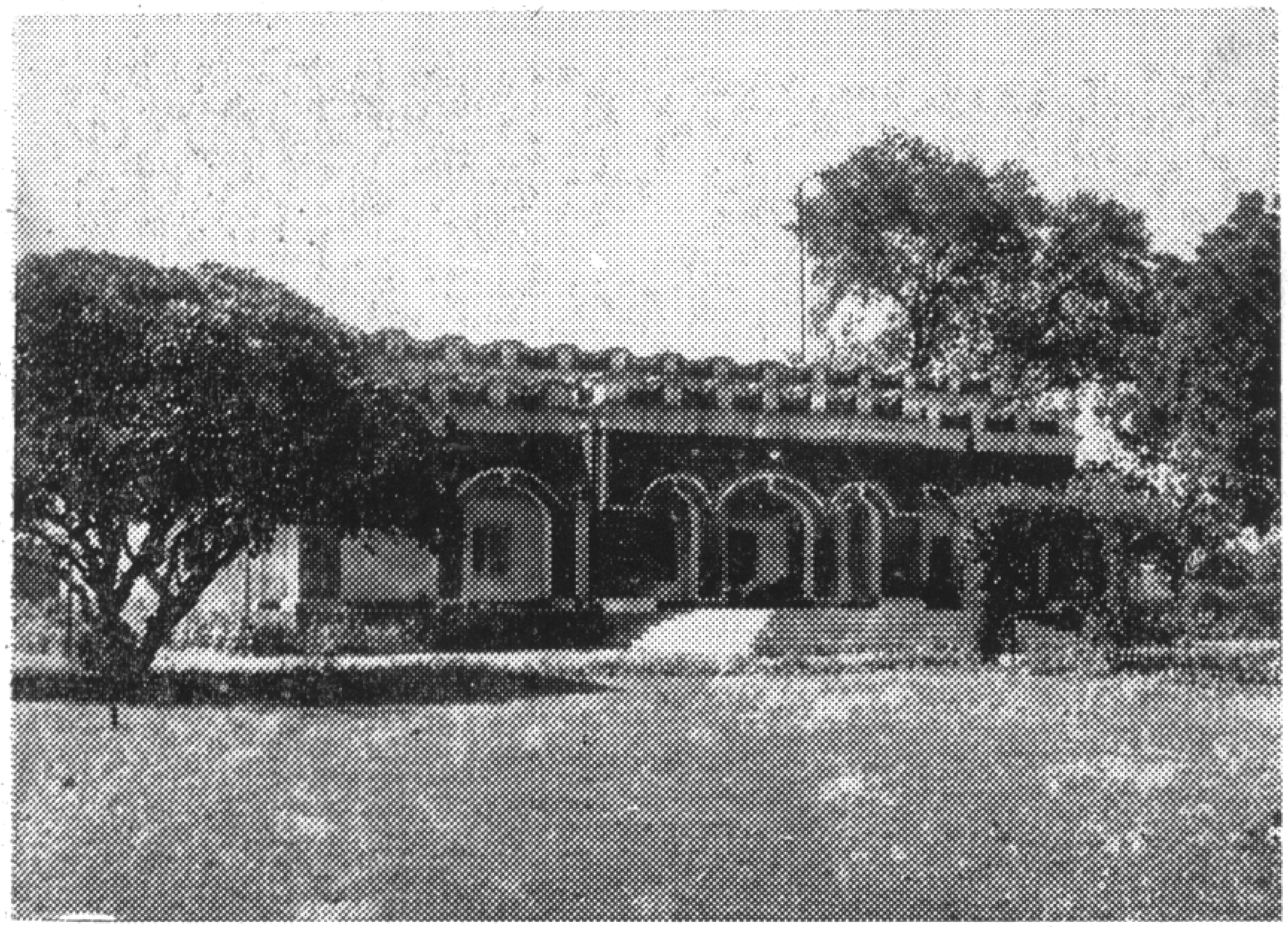


মুক্তির পর (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০)

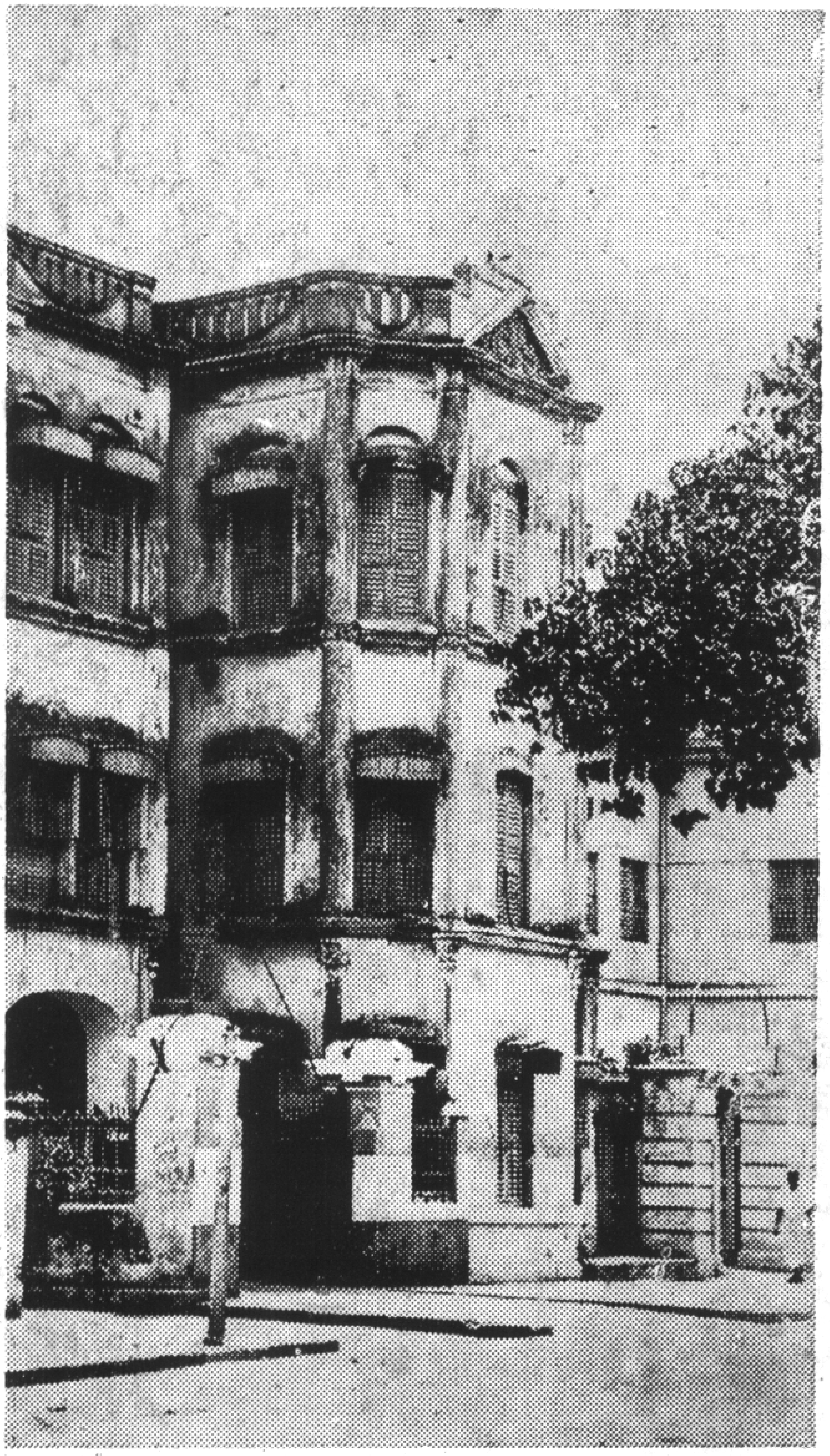
মুক্তির পর (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০)



সুভাষচন্দ্রের ঘর যেভাবে সাজানো ছিল



বারারির বাড়ী



এল্‌গিন রোডের বাড়ী



উডবার্ন পার্কের বাড়ী



বার্লিনে পৌঁছবার পর সুভাষচন্দ্র

আমি ক্রমাগত মাথা ঘামাতে লাগলাম কিভাবে উনি চুপিচুপি বাড়ি থেকে বার হয়ে কিছু দূরে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠতে পারেন। আমি এমন ভাবলাম যে, রাঙাকাকাবাবু ছদ্মবেশে বাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে জমাদারদের আসা-যাওয়ার জন্য যে ছোট গেট আছে তাই দিয়ে বার হবেন, আমি এলগিন রোড পোস্ট অফিসের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, আর ওঁকে পথ থেকে তুলে নেব। বাড়ির পিছন দিকে একটা কারখানা থাকায় সেদিক দিয়ে বার হওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া কোন পেছনের দরজাও ছিল না। আমরা এই ধরনের বিভিন্ন প্ল্যান নিয়ে অনেক অনেক আলোচনা করলাম। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, সব চাইতে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ প্ল্যান হল বাড়ির মধ্যেই উনি গাড়িতে উঠবেন। তারপর সেই অনুযায়ী অন্যান্য পরিকল্পনা করা স্থির হল।

॥ ৭ ॥

আমরা এক দিকে রাতের পর রাত ধরে বিভিন্ন পরামর্শ ও পরিকল্পনা করতে লাগলাম, অন্য দিকে রাঙাকাকাবাবু যাত্রার পথে যে সব বিভিন্ন ধরনের বাধা উপস্থিত হতে পারে তার মোকাবিলা করা ও লোকের মনে যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক হতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হলেন। যেমন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, এমনকি চিঠিপত্রে উনি বারবার বলতে লাগলেন যে, ওঁকে তো শীগগিরই আবার জেলে ফিরে যেতে হবে। আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী সকলের কাছে উনি আরো বারবার বলতে লাগলেন, যুদ্ধ শেষ না হলে তো ওঁকে ছাড়বে না, তাই ওঁর ব্যক্তিগত এবং জাতীয় যে সব কাজকর্ম আছে সব গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। যেমন—ওঁর অনুপস্থিতিতে মহাজাতি সদন পরিকল্পনার কি হবে উনি আলোচনা

করেছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশন মহাজাতি সদনের জন্য জমি ব্যক্তিগতভাবে ওঁর নামে লিখে দিয়েছিল। রাঙাকাকাবাবুর চিন্তা হল যে, ওঁর অন্তর্ধানের পরে ওঁর এই মানসগৃহ আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না। একবার ভেবেছিলেন ওঁর অ্যাটর্নীকে বলে এই সম্পত্তি একটা ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে হস্তান্তরিত করে যাবেন। কিন্তু বন্ধুমহলে অকারণে এতে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে ভেবে এই চিন্তা ছেড়ে দিলেন।

আলিপুর কোর্টে ওর বিরুদ্ধে দুটো কেস চলছিল—একটা কিছুকাল আগে একটি রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্য, অন্যটি ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়র জন্য। যাতে কোর্টে কিছুতেই হাজির না দিতে হয়, এর জন্য উনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। হাজিরা না দেবার পক্ষে ওঁর ভগ্নস্বাস্থ্য বেশ জুতসই অজুহাত হল। কিছুদিন এ নিয়ে কোন অসুবিধা হল না। ওঁর চিকিৎসক ভাই সুনীলচন্দ্র বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ মণি দে-কে কন্‌সালটকরতেন এবং তিনি সহজেই কোর্টে দাখিল করার প্রয়োজনীয় মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে দিতেন। কিন্তু পরে যখন রাঙাকাকাবাবুর শরীর একটু ভাল হল তখন ওঁর ডাক্তার ভাই বেঁকে বসলেন। উনি বললেন, জেলে যাওয়া এড়াবার জন্য এইভাবে সুভাষের মেডিকেল কৈফিয়ত দেখানো অনুচিত। যদি ওঁর ডাক্তার ভাইয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা ওঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে মেডিকেল কলেজের প্রধান চিকিৎসক মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেন তবে কী হবে! তাই এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে ওঁর ডাক্তার ভাইকে পাশ কাটিয়ে মেডিকেল কলেজেরই একজন নাম-করা সার্জেন এবং রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু ডঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জিকে ডাকা হল। তিনি রাঙাকাকাবাবুকে পরীক্ষা করে বিশেষ একটি সার্জিক্যাল অসুস্থতার কথা লিখে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

আত্মীয়-স্বজন, আগন্তুক, বাড়ির ভৃত্যরা, সাদা পোষাকের

পুলিশ যারা বাড়ির চারধারে প্রহরায় ছিল, এমন কি আমাদের ডাক্তার-কাকার পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটিরও গতিবিধি, বিশেষতঃ রাত্রিবেলার চলাফেরার উপর বিশেষভাবে নজর রাখা হল। বাড়ির ভিতরের এই নজর রাখায় ইলা সাহায্য করত, আমি নজর রাখতাম বাড়ির চারপাশে নিযুক্ত টিকটিকিদের উপর। বিশেষতঃ রাত করে উডবার্ন পার্কে ফিরে যাবার সময় ওরা কি করছে নজর করতাম। একজন বেকার আত্মীয় রোজই রাঙাকাকাবাবুর কাছে আসতেন। আমি কেন রোজ রাত্রে ওঁর কাছে যাই এ বিষয়ে তিনি অকারণে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করেন। রাঙাকাকাবাবু তাঁকে টাটা প্রতিষ্ঠানের বড় সাহেবের কাছে একটা পরিচয়পত্র লিখে জামসেদপুরে রওনা করে দিলেন। যাবার আগে এরকম দীর্ঘদিন বেকার থাকার বিড়ম্বনা সম্বন্ধে অনেক বোঝালেন, আর বলে দিলেন—যতদিন না চাকরি হয় কিছুতেই হাল ছাড়বে না এবং জামসেদপুর থেকে নড়বে না। এই প্ল্যান খুব ভাল কাজ করেছিল, ভদ্রলোকটি নেতাজীর অন্তর্ধানের পর চাকুরিহীন অবস্থাতেই কলকাতায় ফিরে এলেন।

তখন বাবা-মা কলকাতায় নেই। আমি একলা উডবার্ন পার্কে আছি। সে সময় বোম্বাই থেকে একজন পারিবারিক বন্ধু সস্ত্রীক রাঙাকাকাবাবুর অতিথি হিসেবে এসে উপস্থিত হলেন। আমার উপর উডবার্ন পার্কে এঁদের রাখবার ও দেখাশোনার ভার দেওয়া হল। এঁদের উপস্থিতির ফলে আমার এলগিন রোডে রাঙাকাকাবাবুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াতের বেশ একটা নতুন অজুহাত তৈরি হল।

১৯৪০-এর বড়দিনে আমাকে একটা সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে হল। রাঙাকাকাবাবু বললেন, সকালে উঠে গাড়ি চালিয়ে বর্ধমান চলে যাও। ওখানে রেল স্টেশনে দুপুরের খাওয়া খেয়েই আবার সোজা গাড়ি চালিয়ে কলকাতা ফিরে এসে কতটা ক্লান্ত হয়েছি তা রিপোর্ট করতে হবে। চলে গেলাম। ফিরে এসে রিপোর্ট করলাম, অবস্থা মোটামুটি ভালই।

যখন আমাদের কথাবার্তা ও ব্যবস্থাদি বেশ খানিকটা এগিয়েছে, তখন আমি এই অন্তর্ধান-পর্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ভার পেলাম। যেমন রোজ সন্ধ্যাবেলা যাই তেমনি সেদিনও রাঙাকাকাবাবুর কাছে গিয়েছি। গিয়ে দেখলাম ঘর-ভরতি অনেক লোক। আমি তাই বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন এবং একজন সুদর্শন পাঠানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি হলেন মিয়া আকবর শাহ। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে সেদিন রাত্রেই মিয়াসাহেব দেশে ফিরে যাচ্ছেন, রাঙাকাকাবাবু তাঁর সেক্রেটারিকে আগেই হাওড়া স্টেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মিয়াসাহেবের রেল টিকেট ও রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে। আমাকে ভার দিলেন প্রথমে মিয়াসাহেবকে আমার গাড়িতে করে একটু কেনাকাটার জন্য বাজারে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তাঁর হোটেল থেকে মালপত্র তুলে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। রাঙাকাকাবাবু আমাকে বিশেষ করে বলে দিলেন স্টেশনের ভিতরে যেন আমি না যাই। ওঁর সেক্রেটারি স্টেশনের সামনেই থাকবেন, এবং মিয়াসাহেবকে রওনা করে দেবেন। আমি যেন মিয়াসাহেবকে স্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় ছেড়ে দিয়েই চলে আসি।

সেদিন আমার গাড়ির ড্রাইভার ছিল, আমি মিয়াসাহেবের সঙ্গে পিছনের সীটে বসে ইংরেজীতে আলাপ করতে লাগলাম। উনি আমাকে বললেন, রাঙাকাকাবাবু ওঁকে বলেছেন যে, তাঁর ওপর যেমন অপর প্রান্তের ও সীমান্তের ওপারের ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত হয়েছে তেমনি এ প্রান্তে ওঁর সাহায্যকারী হিসাবে উনি আমাকে বেছে নিয়েছেন। মিয়াসাহেব আমাকে

বললেন, ওঁকে ধর্মতলার ওয়াছেল মোল্লার দোকানে নিয়ে যেতে। উনি একটা টুপি ও পাজামা-নেতাজীর ছদ্মবেশের জন্য কিনবেন। উনি যখন হাওড়া স্টেশনে নেমে যাবেন তখন ইচ্ছাকৃতভাবে প্যাকেটটা ভুলে ফেলে যাবেন, আর আমি প্যাকেটটির ভার গ্রহণ করব। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, রাঙাকাকাবাবুর ঘরে একটা দরজীর জামা-কাপড় মাপার ফিতে পড়ে আছে।

॥ ৯ ॥

আমরা নির্দেশমত সব কাজ করে গেলাম। আমি আর মিয়া আকবর শাহ একসঙ্গে ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ঢুকলাম, কিন্তু উনি যখন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি পিছিয়ে পড়ে দূর থেকে নিরাসক্তভাবে দেখতে লাগলাম। উনি এক জোড়া ঢিলে পাজামা আর একটা কালো ফেজ জাতীয় টুপি কিনলেন। প্যাকেটটা গাড়ির পিছনের সীটে হেলাভরে ফেলে রাখা হল। এরপর আমরা মির্জাপুর স্ট্রীটে যে হোটেলে উনি ছিলেন সেখানে গেলাম। ওঁর মালপত্র তুলে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে রওনা দিলাম। গিয়ে দেখলাম রাঙাকাকাবাবুর সেক্রেটারি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি মিয়াসাহেবকে নামিয়ে নিলেন। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে যেতে বললাম। আমরা স্টেশন চত্বর ছেড়ে বের হয়ে যাবার আগেই ড্রাইভারের নজরে পড়ে গেল পিছনের সীটে প্যাকেটটা। সে বলতে লাগল যে দৌড়ে গিয়ে এখনও প্ল্যাটফর্মে প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। কি মুশকিল, আমি এমন ভান করলাম যেন এত ঝামেলা আমার ভাল লাগছে না। আমি বললাম, এখন বাড়ি যাওয়া যাক। যা কিছু জিনিস পড়ে আছে, পরে ডাকে ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

আমাকেও অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কিছু কেনাকাটা করতে

হল, রাঙাকাকাবাবুই অবশ্য এর জন্য টাকা দিলেন। হ্যারিসন রোডের একটা দোকান থেকে একটি মাঝারি সাইজের স্যুটকেস, একটা অ্যাটাচি কেস, বিছানার জন্য হোলড-অল্ কিনলাম। স্যুটকেস ও অ্যাটাচি কেসের উপর আমি M. Z. লিখিয়ে নিলাম। আর, কিনলাম নিউ মার্কেট থেকে একজোড়া ফ্লানেলের শার্ট আর টয়লেটের জিনিসপত্র। রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশমত আমি অবজ্ঞাভরে সব দেশী জিনিস ত্যাগ করে কেবলইংরি টিশ মেক-এর যাবতীয় জিনিসপত্র কিনলাম। বালিশ, বিছানার চাদর, লেপ ইত্যাদি যোগাড় করলাম চাঁদনী চক থেকে। উনি যে ধরনের সুগঠিত কাবুলী চপ্পল চাইছিলেন তা পেতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হল। শেষ পর্যন্ত নিউ মার্কেটের একটা চীনা দোকান থেকে এক জোড়া কিনে ফেললাম।

রাঙাকাকাবাবু য়ুরোপে যে গরম কাপড়জামা পরতেন তা থেকে একবার কিছু কিছু বেছে নিতে চাইলেন। সে সব জামাকাপড় থাকত উডবার্ন পার্কের বাড়িতে মার হেফাজতে। মা কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি আলমারীর চাবিটা কোথায় থাকে জেনে রেখেছিলাম। বলেছিলাম, রাঙাকাকাবাবু একবার সব জামাকাপড় দেখতে চেয়েছেন, অনেক দিনের মত জেলে চলে যাবেন তো, তাই। ওঁর ভৃত্য এসে কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে লাগল, তার থেকে উনি কিছু গরম জামাকাপড় ও একটি গলাবন্ধ কোট নিলেন, ওই রকম একটা কাপড়ের পুঁটুলির ভিতরে করে আমি ওঁর হোলড-অল্টা পাঠিয়ে দিলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরকার হবে মনে করে উনি ওটা কাছে রাখতে চাইছিলেন।

জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়া, অ্যাটাচি কেসে ঢোকাবার জন্য আমার হাতে দু'কপি পবিত্র কোরান গ্রন্থ, কিছু ঔষধ—মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মিস্টল্ এবং ভাজা মসলার কৌটা ইত্যাদি দিয়েছিলেন।

ওঁর জন্য কিছু ভিজিটিং কার্ড ছাপাতে গিয়ে আমাকে প্রথমে

স্টেজ অ্যাকটিং করতে হল। কি লেখা হবে তা নিজের হাতে লিখে দিয়ে আমাকে বললেন ঐ লেখাটা কপি করে নিয়ে ওঁর হাতের লেখাটা নষ্ট করে ফেলতে। উনি আমাকে বললেন—যখন কার্ডের অর্ডার দিতে যাব তখন যেন এমন ভাব দেখাই যে নিজের জন্যই অর্ডার দিতে যাচ্ছি। অতএব একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি স্যুট পরে, মাথায় ফেল্‌ট হ্যাট দিয়ে সাহেব সেজে বাড়ি থেকে বার হলাম। সে সময়ে আমার বয়সী ছেলের পক্ষে এই ধরনের পোষাক পরা প্রচলন ছিল না। এক পাহাড়ে বা শীতের জায়গায় গেলে আলাদা কথা। বাড়ি থেকে বার হবার মুখেই এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে দেখা।

একটা ডিনারের নেমন্তন্ন আছে বলে আমার পোষাক সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চৌরঙ্গী থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাধাবাজারে এক দোকানে উপস্থিত হলাম, কাউণ্টারের লোকটির সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে কার্ডের অর্ডার দিলাম। আবার কার্ড নেবার দিন একইভাবে সেজেগুজে ডেলিভারী নিলাম ও কার্ড মালিকের হাতে পৌঁছে দিলাম। কার্ডে লেখা ছিল :

MOHD. ZIAUDDIN

Travelling Inspector,

The Empire of India Life Assurance Co. Ltd.

Permanent Address:
Civil Lines
Jubbulpore

॥ ৯ ॥

রাঙাকাকাবাবুর মালপত্র চুপিচুপি উডবার্ন পার্কে আমার তিনতলার ঘরে জমা করছিলাম। সে-সময় আমার বাবা, মা ও বাড়ির অন্যান্যরা কলকাতার বাইরে থাকায় গোপনে জিনিসপত্র ওপরে তোলা নিয়ে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ভৃত্যেরা যাতে কোন সন্দেহ না করে সেজন্য সাধারণত আমি জিনিসপত্র দুপুরবেলার দিকে যখন ওরা বিশ্রাম করত তখন নিয়ে আসতাম। বেডিংটা গুটিয়ে আমি নিজের আলমারীর ভিতরে রাখলাম। স্যুটকেসটা রাখলাম আরও দু-একটা ঐরকম বাক্সর সঙ্গে আমার খাটের তলায়। জামাকাপড় ও ছোটখাট জিনিস লুকিয়ে ফেলা সহজ ছিল। আমার ঘরে আমি একাই শুতাম, অন্য লোকজন বড় একটা আসত না।

কোন্ মোটর গাড়িটা নেওয়া হবে, তাও আমরা বেশ কিছু দিন ধরে আলোচনা করলাম। সে-সময় আমার বাবার দু'খানা গাড়ি ছিল, একটা খুব বড় স্টুডিবেকার প্রেসিডেন্ট, অন্যটি একটু কম চেনা জার্মান গাড়ি—ওয়ানডারার। স্টুডিবেকার গাড়িটা আমার মায়ের নামে রেজিস্ট্রি করা ছিল আর ওয়ানডারারটা ছিল আমার নামে। ছোটবেলা থেকেই গাড়ি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতার কথা বাবা জানতেন। একটা গাড়ি আমার নামে থাকার হয়ত সেটা একটা কারণ। যদিও ছোট ওয়ানডারার গাড়িটা আমি বেশী ব্যবহার করতাম, বাবা কিন্তু আমাকে দুটো গাড়িই ইচ্ছামত ব্যবহার করতে দিতেন। আমি গাড়ি চালিয়ে যথেষ্ট ঘুরে বেড়াতাম, অবশ্য বাবার সুবিধা-অসুবিধা বুঝে। গাড়ি চালানোর দিক থেকে বলতে গেলে দুটো গাড়িতেই আমার সমান দখল ছিল। প্রথম দিকে আমরা স্টুডিবেকার গাড়িটা নেওয়া ঠিক করেছিলাম; কারণ, ও গাড়িটা

সহজে খারাপ হয় না আর স্পীডেও যায়। পরে অন্যান্য কতকগুলি কারণে ওয়ানডারার গাড়িটাই বেছে নেওয়া হল। প্রথমত, বাবা যখন কলকাতায় রয়েছেন তখন স্টুডিবেকার গাড়িটা নিয়ে আমার দু'দিনের জন্য উধাও হয়ে যাওয়াটাই কেমন যেন দেখাবে। তা ছাড়া গাড়িটার একটা বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, আর বাবার গাড়ি হিসাবে চারিদিকে পরিচিত। অন্যদিকে ওয়ানডারার গাড়িটা আমারই নামে রয়েছে ; আমি যদি ক'দিন গাড়িটি চালিয়ে এদিক-সেদিক যাই, কেউ কিছু ভাববে না। যে মুহূর্তে ঠিক হল ওয়ানডারার গাড়িটাই যাবে, অমনি আমি লেগে পড়লাম গাড়ির এঞ্জিন ও সব কিছু পার্ট চেক-আপ করাতে। একটা বাড়তি টায়ার কিনলাম, নতুন ব্যাটারি লাগালাম, নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য একদিন গাড়ি চালিয়ে পার্ক সার্কাস এলাকার একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে টায়ার বদল করা অভ্যাস করে নিলাম। ইতিমধ্যে স্টুডিবেকার গাড়িটি চড়ে আমাদের একদল আত্মীয়স্বজন ধানবাদের কাছে আমার দাদার বাড়িতে ছুটি কাটাতে চলে গেলেন।

আমার মনে হল দাদার ওখানে ধানবাদে একবার ঘুরে আসাটা প্রস্তুতি হিসাবে আমার খুব কাজে লাগবে। তাই এমনভাবে আমি ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার মাকে কলকাতা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়। বোম্বাই থেকে আগত অতিথিরা জানুয়ারির প্রথমে ফিরে গেলেন। আমি তাদের সঙ্গেই ট্রেনে চেপে ধানবাদ পর্যন্ত চলে গেলাম। দিন দুয়েক দাদার ওখানে বারারিতে থাকার ফলে জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখে নেবার ও মনে মনে কতকগুলি পথের নিশানা ঠিক করে নেবার বেশ অপূর্ব সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমার পরবর্তী যাত্রায় এ সবই খুব কাজে লেগেছিল। তখনও পর্যন্ত অন্তর্ধান পর্বের খুঁটিনাটি প্ল্যানিং একেবারে ঠিক হয়ে যায়নি। কিন্তু মোটামুটি ঠিক হয়েছিল যে, আমি অন্ততঃ এক রাত্রি দাদার বারারির বাড়িতে বিশ্রাম নেব। তা ছাড়া আমি যেন কোন কাজে দাদার ওখানে গিয়েছি, এইভাবে ব্যাপারটা সাজালে বাড়িতে আমার অনুপস্থিতি কারুর মনে সন্দেহের

উদ্রেক করবে না। রাঙাকাকাবাবু আমাকে যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন সেইমত আমি দাদাকে বারারিতে শুধু বললাম—'রাঙাকাকাবাবুর কোন কাজে আমাকে শীগগিরই এদিকে আসতে হবে, সে সময়ে আমি আবার আসব।'

আমাদের পারিবারিক যে দলটি স্টুডিবেকার গাড়ি করে কলকাতা ফিরছিল, আমি সেই দলের সঙ্গে সেই গাড়িতে উঠলাম। আমি বারারি থেকে ধানবাদ রাস্তাটি ও পরে কলকাতা পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে এলাম। আর কয়েক দিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে এই পথেই আমাকে আসতে হবে।

আসানসোল ও বর্ধমানের মাঝখানে একটা বড় রকম যান্ত্রিক গোলযোগ হয়ে গাড়ি অচল হয়ে গেল। অবস্থা এমনি হল যে, কলকাতা থেকে একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ না আনালে গাড়ি চলবে না। আমরা সেখানে গাড়ি রেখে রাস্তা থেকে একটা ঝরঝরে ট্যাক্সি চড়ে কলকাতা ফিরলাম। এই ঘটনা দেখে আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যখন সময় আসবে ওয়ানডারার গাড়ি যেন এরকম ব্যবহার না করে।

॥ ১০ ॥

বারারি-ধানবাদ এলাকা পর্যবেক্ষণ করে আমার ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান-পর্বের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হল। রাঙাকাকাবাবু একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। কারণ, সীমান্ত প্রদেশ থেকে সবুজ সংকেত এসে পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। প্রথম যখন রাঙাকাকাবাবু এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন বলেছিলেন, ডিসেম্বরের শেষেই রওনা হয়ে পড়বেন। তা যদি হত তা হলে কিন্তু যাবার আগে বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হত না। বাবা কালিম্পং থেকে ফিরলেন জানুয়ারিতে।

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কিভাবে নিষ্ক্রান্ত হবেন সব স্থির হয়ে গেল। উনি পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরে থাকবেন। একদিন রাত্রে উনি পোষাক পরে ঘরের বিরাট আয়নায় নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে দেখে নিলেন।

পরদিন আমি আসতেই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বললেন যে, ছদ্মবেশ খুব ভাল হয়েছে, ভিড়ের মধ্যেও কেউ ওঁকে চিনতে পারবে না। শুনে আমি হাসলাম এবং সাহস করে বলেও ফেললাম যে, সুভাষচন্দ্র বোসের চেহারা ও ব্যক্তিত্ব যত ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন, লুকনো সম্ভব নয়। শুনে উনি কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

এরপর তিনি সকলের চোখে ধুলো দেবার যে পরিকল্পনা করেছেন সেকথা প্রকাশ করলেন। রাঙাকাকাবাবু ঘোষণা করবেন যে, উনি কিছুদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাচ্ছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত অবসর-ব্রত যাপনের সময় উনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না বা কথাও বলবেন না। ওঁর ঘরের মধ্য দিয়ে দু'টি পর্দা দুই দিক থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যাতে করে ঘরের উত্তর দিকটা সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাবে। রাঙাকাকাবাবু ঘরের সেই দিকটায় থাকবেন এবং তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করবেন। যে ঠাকুর ওঁর মার রান্না করে, তার উপর ভার থাকবে ওঁর খাবারটা সময়মত পর্দার তলা দিয়ে ঠেলে দেওয়ার। আহার্য হবে নিরামিষ, তরকারি, দুধ, ছানা, মিষ্টি আর ফল। উনি চলে যাওয়ার পর ইলাকে এই ভাঁওতাটা চালিয়ে যেতে হবে। খাবারগুলো খেয়ে নিতে হবে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে হবে।

একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, একমাত্র মাজননী ও ইলা ছাড়া বিরাট বসু পরিবারের আর সকলেই তিনতলায় শুতেন, রাঙাকাকাবাবুর শোবার ঘর দোতলায়। আরও একটা সুবিধা ছিল এই যে, মাজননী সে সময় বাড়ির বা রাঙাকাকাবাবুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তা ছাড়া রাঙাকাকাবাবুর এই ধরনের ব্রত উদ্‌যাপনের প্রস্তাবে কারুরই খুব আশ্চর্য হবার কথা নয়—বিরোধিতার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

রাত্রের খাওয়ার পর বাড়ির চাকরবাকররাও শুতে চলে যেত। একমাত্র রাঙাকাকাবাবুর যে ব্যক্তিগত ভৃত্য, তাকে একটু সামলে নিতে হবে। তার ওপরেই একতলার সদর দরজা বন্ধ করার ভার। বাইরের গেটে তো তালা পড়তই না, শুধু ভেজানো থাকত। ঠিক হল—সে রোজ যেমন করে সেদিনও তাই করবে। তারপর তাকে ছুটি দিয়ে শুতে যেতে বলা হবে। সৌভাগ্যবশত তার ঘুম ছিল গভীর।

আমরা ঠিক করলাম যে, সদর দরজা ব্যবহার না করে আমরা বাড়ির পিছনে রান্নাবাড়ির যে ছোট সিঁড়ি আছে তাই দিয়ে নীচে নামব। আমাদের ডাক্তার-কাকাবাবুর যে অ্যালসেশিয়ান কুকুরটি আছে সেটা আবার রাত্রে ছাড়া থাকে, তাকে নিয়ে একটা সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে একদিন একজন বিশিষ্ট অতিথি রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যখন একটু রাত করে বাড়ি ফিরছেন তখন সেই অ্যালসেশিয়ানটি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইলা এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে রাঙাকাকাবাবুর তরফ থেকে ডাক্তার-কাকাবাবুকে গিয়ে বলল যে, রাত্রের দিকে কুকুরটা বেঁধে রাখলে ভাল হয়, কারণ অনেকেই রাত করে রাঙাকাকাবাবুর কাছে যাওয়া-আসা করেন। বাড়ির বাইরে কোন আলো রাত্রে জ্বালানো থাকত না। রাঙাকাকাবাবুকে অবশ্য একটা দীর্ঘ করিডর পার হয়ে যেতে হবে। আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ উঁকি মেরে দেখে ফেলার ভয় থাকবে। বাড়ির বাইরে সাদা পোষাকে যেসব পুলিশ বিভাগের লোক থাকত, দিনকতক তাদের হাবভাব নজর করলাম। আমি রাঙাকাকাবাবুকে জানালাম যে তারা যেন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। মনে হয় একটু রাত হলেই বেশ কাজে ঢিলে দেয়। শুধু দেখতে হবে যে, গাড়ি করে যখন বার হব তখন গেটের খুব কাছাকাছি তারা কেউ না থাকে।

অন্তর্ধানের দিন দশ-বারো আগে আমার বাবা কলকাতায় ফিরলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে বললেন বাবাকে গিয়ে বলতে যে, যত শীঘ্র সম্ভব উনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি

গিয়ে মাকে খবরটা পৌঁছে দিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় তুই ভাই মিলিত হলেন। দিন তুয়েক বাদে মা আমাকে বললেন যে, বাবা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করছিলেন—'তোমার ছেলে কি বাবা-মাকে না বলেই কাকার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে চলেছে?' আমি চুপ করে শুনলাম। আমার বাবা-মা যে এখন সব কিছু শুনেছেন এবং এত ভালভাবে গ্রহণ করেছেন, এটা জেনে কিন্তু আমার মনে একটা আত্মবিশ্বাস ও তৃপ্তির ভাব এসে গেল। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, ইদানীং রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে দীর্ঘ নৈশ আলোচনার সেসন্‌গুলি ছোট করে দিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক এই সময় রাঙাকাকাবাবু আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ কিনা এবং আমি নিজে শেষ সংগ্রামের জন্য 'প্রস্তুত' কিনা। বাবা আমার সঙ্গে একেবারে যাত্রার দিনে ছাড়া এ নিয়ে কোন সোজাসুজি কথা বললেন না। কিন্তু মার কাছ থেকে আমি জানতে পারছিলাম যে, তুই ভাইয়ে মিলে সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া খতিয়ে দেখছেন।

ঐতিহাসিক সেই দিনটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে বললেন, বাবা আমাদের পরিকল্পনার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। একটা পরিবর্তন হলঃ বাবা চান এই যে, রাঙাকাকাবাবু চলে যাওয়ার পর উনি লোকচক্ষুর আড়ালে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন বলে ভাঁওতা দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশকে বলতে হবে, এ ব্যাপারে এলগিন রোডের বাড়ির কোন একটি ছেলেকে ভার দেওয়া হোক। আমি তো এলগিন রোডে থাকি না, সুতরাং আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব ছিল না। পরে পুলিশের যে অবশ্যম্ভাবী জুলুম হবে, ইলার মত অল্পবয়সী মেয়ে তার মুখোমুখি হোক এটা বাবা একেবারেই চান না। রাঙাকাকাবাবু বাবার কথা মেনে নিয়েছেন মনে হল। বললেন, 'তুমি একটু ভেবে বল কাকে নেওয়া যায়।' আমি আমাদের জ্যাঠতুতো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম করলাম। খানিক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল, ইলাকে একটু আড়ালে রেখে ওর

উপরই ভাঁওতা বজায় রাখার কাজ দেওয়া হবে। ইলা অবশ্য সব বিষয়ে সাহায্য করবে।

॥ ১১ ॥

রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশমত এক সন্ধ্যায় ইলাকে আমার গাড়িতে করে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গেলাম। আমি কালীমন্দিরের দরজায় অপেক্ষা করলাম, ইলা একটি ছোট তাম্রপাত্র নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। পূজার ফুল ও চরণামৃত হাতে করে সে বাড়ি ফিরে এল।

যখন আমাদের যাত্রার চূড়ান্ত প্ল্যান হয়েছিল তখন কথা হয়েছিল, আমি ধানবাদের কাছে কোন ডাকবাংলোতে রাঙা-কাকাবাবুকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বারারিতে দাদার বাড়িতে চলে যাব। সেখানে দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা আবার ডাকবাংলো থেকে ওঁকে তুলে নিয়ে যে রেল-স্টেশনে উনি যেতে চাইবেন সেখানে পৌঁছে দেব। কিন্তু একেবারে শেষের দিকে উনি আমাকে বললেন যে, অন্য জায়গায় যাওয়ার চাইতে উনি বরঞ্চ ছদ্মবেশে দাদার বাড়িতেই দিনটা কাটাবেন। বললেন—'দেখ, অজানা লোকের সঙ্গে থাকার ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে নিজের লোককে যতটা দরকার ততটা বলে দিয়ে নির্ভর করা ভাল।' সে-সময় হয়ত আমার মামার বাড়ির কিছু লোক বারারিতে থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা ছিল। উনি বললেন, তা হলেও ডাকবাংলোর চাইতে দাদার বাড়িতে থাকাই শ্রেয়-মনে করেন।

আমরা ক'দিন ধরে কেবলই ভাবছিলাম, কি করে ওয়ানডারার গাড়ির ড্রাইভারটিকে দু-তিন দিনের জন্য সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোন উপায় ভেবে পাচ্ছিলাম না। যাত্রার ঠিক ক'দিন আগে প্রায় দৈব আশীর্বাদের মত একটা ব্যাপার ঘটল। ড্রাইভারের দেশ থেকে চিঠি এল, তার মা গুরুতর অসুস্থ, তাকে এখনি

দেশে যেতে হবে। খবর শুনে আমার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল, দৌড়ে গিয়ে রাঙাকাকাবাবুকে বললাম, আজ একটা সুখবর আছে। ড্রাইভারকে টাকা-পয়সা দিয়ে যতদিন প্রয়োজন তার মার কাছে থাকতে ছুটি দেওয়া হল।

আমি কেন হঠাৎ দাদার কাছে যাব, তার একটা জুতসই কারণ থাকা দরকার। ঠিক হল—বলা হবে বউদিদি অসুস্থ হয়েছেন, তাই বাবা আমাকে নিজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে বলেছিলেন—ব্যাপারটা কি। কথা হল যে, আমি সেখানে পৌঁছে বাবাকে টেলিগ্রাম করব যে, বউদিদি ভাল আছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

যদি পথে কেউ আমাদের গাড়ি থামায় ও চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে কি করা হবে? আমি এমন ভাব করব যেন আমিই গাড়ির মালিক, যেন এখন শখ করে গাড়ি চালাচ্ছি। আর সুভাষচন্দ্র বসু হলেন আমার ড্রাইভার, ড্রাইভার সঙ্গে রয়েছে। আমি হেসে বললাম, 'গাড়ির মালিক আর ড্রাইভারের চেহারার দিকে তাকালে গল্পটা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে কি?' রাঙা-কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক হবে, তুমি কোন কথা বলবে না। গম্ভীর হয়ে মালিকের মত বসে থাকবে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে যাব। অভিনয় যা করবার তা আমিই চালিয়ে নেব।' যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছি, পরবর্তী স্টেশনের নামটা করতে হবে, এত রাত্রে কেন চলেছি জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে, রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই আটকে পড়েছিলাম।

যাত্রার পূর্বে রাঙাকাকাবাবু আমাকে ঠিক দু'দিনের নোটিস দিলেন। ১৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯৪১ সন্ধ্যাবেলা যাত্রা শুরু। আমি তখুনি আবার ওয়ানডারার গাড়ির তদারকে লাগলাম। সার্ভিস করতে দিতে গিয়ে দেখলাম বৃহস্পতিবারের আগে বুকিং নেই, তাতেই অগত্যা রাজী হলাম।

আমি তখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র,

মৃতদেহ কাটা-ছেঁড়ার কাজে নিযুক্ত, কলেজ থেকে ছুটি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সেদিন সকালেও কলেজ করলাম। শুধু কি একটা অজুহাতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম, কেন ক'দিন আসতে পারলাম না এসব কথা কলেজে পরে বললে চলবে, আগে তো ঘুরে আসি। আমার কোন ছদ্মবেশের প্রশ্ন নেই। সেকালে আমরা সাধারণত যেরকম পোষাক পরতাম তাই পরলাম—ধুতি, শার্ট, তারপর গরম কোট আর জুতো। রওনা হবার আগে রাঙাকাকাবাবু তাঁর নিজের কাশ্মীরী কাজ-করা গরম টুপিটা আমাকে দিলেন। বললেন, দিনের আলোয় গাড়ি চালাবার সময় অথবা কোন লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার প্রয়োজন হলে টুপিটা পরে নিতে। এতে চেহারায় একটা অন্যরকম ভাব আসবে। এই টুপিটা রাঙাকাকাবাবু তাঁর ত্রিশ সালের য়ুরোপ ভ্রমণের সময় খুব পরতেন। এই টুপি পরে ওঁর অনেক ছবিও আছে। এই কাশ্মীরী টুপিটা আমি আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ঠিক যাত্রার আগের রাত্রে আমার হঠাৎ সন্দেহ হল, আমি রাঙাকাকাবাবুর জন্যে যে স্যুটকেস কিনেছি ও জামাকাপড় গুছিয়ে রেখেছি, সেটা ওয়ানডারার-এর লাগেজ রাখার জায়গার পক্ষে বেশী বড় হবে না তো? স্যুটকেসটা মেপে নিয়ে গিয়ে লাগেজ বুথও মাপলাম। কি সর্বনাশ! যা ভেবেছিলাম তাই। তখন তাড়াতাড়ি করে বাবার একটা স্যুটকেস বার করলাম। একটা স্যুটকেসে M. Z. (মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের নামের আদ্যাক্ষর), অন্যটিতে S. C. B. লেখা ছিল। বাক্স বদল করলাম, M. Z. ও S. C. B. লেখা দুটো মুছে দিলাম, তাড়াহুড়ো করে একটু চাইনিজ ইংক দিয়ে আবার M. Z. লিখে ফেললাম। লেখাটি খুব বাজে হল—কিন্তু কি আর করা! ব্যাপারটা গাড়ি চালাতে চালাতে পরে রাঙাকাকাবাবুর কাছে স্বীকার করলাম। তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

সেই বিশেষ দিনটি শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে সব কাজ করে যাচ্ছিলাম। তবে আমার ভেতরের চাপা উত্তেজনা আমি বাইরে প্রকাশ করছিলাম না। শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবু আমাকে একদিন বললেন—'আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনেক দিন —হয়তো কুড়ি বছর আমি দেশে ফিরতে পারব না, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।' আমার ভাগ্যে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে অন্তর্ধানের দিন যত এগিয়ে এল ওঁর মতামত একটু পালটে গেল। প্রথম দিকে উনি যেন ভেবেছিলেন পুরো ব্যাপারটায় গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব না। কিন্তু যাবার আগে উনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। এক, 'যদি কোনমতে তোমরা চার-পাঁচ দিন চেপে রাখতে পারো, আমি পগার পার হয়ে যাব।' দ্বিতীয়ত, এই অন্তর্ধানে আমার ভূমিকা বেশী দিন গোপন থাকবে না, কারণ, প্রকাশ হয়ে যাবার সূত্র অনেক। তাই আমাকে বলেছিলেন, পুলিশের নির্যাতন ও দীর্ঘদিন কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে। আমার দিকে একটু চেয়ে বলেছিলেন—'কি আর হবে, যুদ্ধ যতদিন চলে, জেলে থাকবে। যেমন দেশের অনেকেই আছে।'

আগেই বলেছি, ওয়ানডারার গাড়িটি সেদিন সার্ভিস হচ্ছিল। সার্ভিস হতে এত অসম্ভব সময় নিতে লাগল যে, আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, বেশ সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর গাড়ি সার্ভিস হয়ে এল। আমি মালপত্র গুছিয়ে রাখলাম।

আমি যখন প্রস্তুত হচ্ছি, দেখি বাবা ধীরপদক্ষেপে তিনতলায় উঠে এলেন এবং আমাকে খোলা ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন।

বাবার মুখচোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বাবার সঙ্গে জীবনে আর আমার এর চাইতে ভাবগম্ভীর আলোচনা কখনও হয়নি। প্রথমেই আমাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন, আমি বেশ বুঝতে পারলাম পুরো পরিকল্পনাটি বাবার নখদর্পণে। আমাদের ছাদটি আলোকিত হয়েছিল। বাবা আমাকে প্রথমেই শেখালেন, এরকম খোলাখুলিভাবে লোকচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে যাকে বলে Conspiracy under the lamp-post করলে সেটাই সবচাইতে সফল হয়! আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাবা বেশ বিচলিত হয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে কাজের ভার নিয়েছি সেটা ঠিকমত করতে পারবো তো? আমি বাবাকে বললাম, গাড়ি চালাতে আমি ভালবাসি। আমার নিজের উপর এবং আমার গাড়ির উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এরপর বাবা বললেন, ওঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, চন্দননগরে ফরাসী পুলিশ চোরাই মাল নিয়ে যাচ্ছি কিনা দেখার জন্য আমাদের চ্যালেঞ্জ করবেই। আর একবার চ্যালেঞ্জ করলে রাঙাকাকাবাবুর এই ছদ্মবেশ কি টিঁকবে! যাই হোক, স্থির হল, বারারি পৌঁছে বউদিদির স্বাস্থ্য কেমন আছে জানিয়ে আমি বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো। বাবা এরপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলেন।

পরে আমি মা'র কাছে শুনেছিলাম যে, বাবা সে রাত্রে প্রায় দুটো পর্যন্ত জেগেছিলেন এবং একবার ঘর আর একবার রাস্তার দিকের ছোট বারান্দা, ক্রমাগত এই করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন আমরা উডবার্ন পার্কের বাড়ির সামনে দিয়ে যাব। ওয়ানডারার গাড়ির পরিচিত আওয়াজ শোনবার আশায় তিনি জেগেছিলেন। কিছু শুনতে না পেয়ে বাবা আমাদের কি হল ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত শুতে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সে রাত্রে আমি নীচে নেমে এসে ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি খাবার চাইলাম। বললাম, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে—শুয়ে পড়ব। আমি যতক্ষণ খেলাম মা চুপ করে আমার পাশে বসে রইলেন। তারপর আমি মা'র সঙ্গে ঘরে

গিয়ে পথের খরচার জন্য কিছু টাকাপয়সা নিলাম। মা শুধু বললেন—'জানি না বাবা, তোমরা কি সব করছ!' আর একটু ক্ষীণ হাসি হাসলেন। বাড়িতে অন্য গাড়ির যে ড্রাইভারটি ছিল, তাকেও সে সময় একটু সরাতে পারলে ভাল হয়। ড্রাইভারটি বাইরে খেতে যেত। মাকে ব্যবস্থা করতে বললাম—তিনি ড্রাইভারকে খেতে যাবার ছুটি দিলেন।

আমি ওয়ানডারার গাড়ি গ্যারাজ থেকে বার করে এক পাশে প্যানট্রির দরজার কাছে পার্ক করলাম। গাড়িবারান্দার কাছে সদর দরজায় সব সময় অন্তত একজন লোক থাকত। মালপত্র বার করে গাড়িতে তুলবার সময় তার চোখ এড়াতে হবে। মালপত্র নামিয়ে আনাটা আমি ভাগে ভাগে করলাম। প্রথমে তিনতলা থেকে দোতলায়, তারপর দোতলা থেকে একতলায়। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে বাক্সটা অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলছিলাম। বাড়ির ছোট ভাইবোনদের ও চাকর-বাকরের নজর এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমি জিনিসগুলো গাড়িতে তুলতে পারলাম।

তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হবে, আমি যাবার জন্য তৈরী হলাম। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে গাড়িবারান্দায় এসে সেখানে যে ভৃত্যটি ছিল তাকে বললাম, আমি একটু রিষড়ার বাগান বাড়িতে যাচ্ছি। যদি বেশী দেরি হয়ে যায় তবে রাত্রিটা ওখানেই কাটাব, রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত দেখে ওরা যেন আর অপেক্ষা না করে গেট বন্ধ করে দেয়।

আমি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এলগিন রোডের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে গাড়ি ঘোরালাম। লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি পেট্রল স্টেশনে ঢুকে গাড়িতে তেল ভরে নিলাম। চাকার প্রেসারটি ঠিক আছে কিনা দেখলাম ও ব্যাটারি চেক্ করলাম, তারপর চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে পশ্চিম দিক থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে ঢুকলাম। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই গাড়ি চালিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে ঢুকে গেলাম আর বাড়ির পিছন দিককার সিঁড়ির কাছে গাড়ি পার্ক করলাম।

কোটটা গাড়িতে রেখে আমি নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ করে দোতলায় উঠে গেলাম।

১৩

রাঙাকাকাবাবু তখন জামাকাপড় ছেড়ে সিল্কের ধুতি ও চাদর পরে নিচ্ছেন, নির্জন বাসের যে ব্রত তিনি গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, সেই ব্রত শুরু হবার আগে মা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সামনে উনি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষবার আহার গ্রহণ করবেন। ইলা, দ্বিজেন আর অরবিন্দ ঘরে পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করছে। রাঙাকাকাবাবু পরে আমাকে বলেন, অরবিন্দকে ভাঁওতা চালিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। ঘরের উত্তর প্রান্তে মাটিতে বসে রাঙাকাকাবাবু তাঁর সেই বিশেষ আহার গ্রহণ করলেন। ওঁকে ঘিরে বসেছিলেন ওঁর মা, বউদিদিরা আর ভাইপো-ভাইঝির দল—বলা বাহুল্য, আমিও তাদের অন্যতম। খাওয়া শেষ হলে মা-জননী ও অন্যান্যরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ওঁরা ঘুণাক্ষরেও জানলেন না যে, এই বিদায় দীর্ঘ বিদায় হতে চলেছে। রাঙাকাকাবাবুর মুখ থমথমে দেখাচ্ছিল, কিন্তু উনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন।

রাঙাকাকাবাবু তাঁর এই ব্রত পালনের সংকল্পের কথা পরিবারের সকলের কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। তবে এই স্বেচ্ছাকৃত নির্জনবাসের সময় কিভাবে কি করতে হবে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরকে কিভাবে পর্দার ওপার থেকে খাবার দিতে হবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজের হাতে কিছু রেডিমেড জবাব লেখা চিরকুট তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। যে-সব লোকজন দেখা করতে আসবে, তারা কি কাজে এসেছে আন্দাজ করে সেগুলো বিলি করতে হবে, এইসব চিরকুটের কোনটিতে লেখা—'এ ব্যাপারে কংগ্রেস অফিসে খোঁজ করুন' ;

অথবা 'এ সম্বন্ধে কর্পোরেশনে খোঁজ করবেন'। নয়তো 'শরীর অসুস্থ, পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে'; অথবা 'অমুকের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলুন' ইত্যাদি। এ ছাড়া জেলে যে-সব সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে উনি কয়েকটা চিঠি লিখে রেখে যান। উনি চলে যাবার পর পরবর্তী কোন কোন দিবসের তারিখ দিয়ে সেগুলো যেন ডাকে ফেলা হয়। এইসব চিঠিরই অন্যতম হল শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথকে লেখা ১৮ই জানুয়ারী তারিখে দেওয়া চিঠি।

38/2 Elgin Road,
Calcutta.
18.1.41.

[illegible]

My dear Kamath,

I was delighted to have your letter after my release and to know that you were well and in good spirits.

I have improved since my release but the progress is slow as my vitality has been lowered. However, there is no cause for anxiety — it will only take time.

I do not know what company you have there. If you have any associates, please give them my most cordial greetings.

I shall be back in jail very soon, because there are two cases going on against me.

With love and cordial greetings and sincerest good wishes

Yours affly
Subhas C. Bose.

V. Kamath Esq.

ক্রমশ রাত্রি গভীর হলে বাড়ির সকলে তিনতলায় যে যার ঘরে শুতে গেলেন। মাজননীও রাঙাকাকাবাবুর ঘরের পাশেই নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন। আমি জানি না, সেদিন তিনি কত রাত্রি অবধি জেগে ছিলেন। আমরা যখন রাত দেড়টার সময় বাড়ি থেকে বার হলাম তখনও তিনি জেগে ছিলেন কি ? বড়দের আর কাউকে নিয়ে কোন সমস্যা হল না। কিন্তু দুই জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো দাদা কেবলই ঘুরঘুর করতে লাগলেন। তাঁদের একজনের সঙ্গে আমি পাশের ঘরে অর্থাৎ ইলার শোবার ঘরে বসে রেডিও শুনতে লাগলাম ও নানারকম গালগল্প করে তাঁকে ভুলিয়ে রাখার ও ক্লান্ত করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজয় স্বীকার করে শুতে যাবার জন্য উঠে পড়লেন, আমিও বাড়ি যাবার ভান করে উঠে দাঁড়ালাম। অন্য দাদাটি কিন্তু এত সহজে ভোলবার পাত্র নন। তা ছাড়া স্পষ্টতই আমাদের কাজকর্ম ওঁর কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। উনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন এত রাত অবধি বাড়ি যাচ্ছি না। আর একবার বললেন, আজ কেন আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। উনি উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গিয়েও আবার একটু পরে ফিরে ফিরে আসছিলেন। একবার তো আমি 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক' বলে বেশ জোরে পা ফেলে নীচে নেমে এসে আবার চুপিচুপি যখন ওপরে উঠে আসছি, ঠিক ওঁর সামনাসামনি পড়ে গেলাম।

অমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, শেষ পর্যন্ত দ্বিজেনকে ডেকে রাঙাকাকাবাবু বললেন, আমার এই সন্দেহগ্রস্ত দাদাটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুতে এবং যেমন করে পারে আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে।

বাইরে যাবার লম্বা টানা করিডর ও বাড়ির পিছন দিককার সিঁড়ি আর একবার দেখে নেওয়া হল, সব ঠিক আছে।

ঘরের সেই পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে রাঙাকাকাবাবু মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পোষাক পরে নিলেন, ওঁর বেডিংটা গুটিয়ে ঠিক করে

নেওয়া হল।

রাঙাকাকাবাবু ওঁর বাদামী রঙের গলাবন্ধ লম্বা কোটের সঙ্গে ঢোলা পায়জামা পরলেন আর মাথায় কালো ফেজ টুপি। ছদ্মবেশের ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে উনি একটা পরিবর্তন করলেন। বললেন, আমি যে কাবুলী চপ্পল জোড়া ওঁর জন্য কিনেছিলাম, সেটা পরে হাঁটা-চলা করা ওঁর পক্ষে কষ্টকর। তাই পুরোনো ফিতে বাঁধা মজবুত যে জুতো য়ুরোপে ব্যবহার করতেন তাই পরে নিলেন। তাইতে উনি বেশী আরাম পেলেন বটে, কিন্তু এই জুতো বিভ্রাটের ফলে পরে আমাদের একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল। যে চশমাটা উনি সে সময় পরতেন, সেটা ছেড়ে রেখে বছর দশেক আগের পুরোনো রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমওয়ালা গোল কাঁচের চশমাটা সঙ্গে নিলেন, বলেছিলেন, যখন একলা থাকবেন বা অন্ধকারে, তখন চশমা ব্যবহার করবেন, নয়ত চশমা ছাড়াই চলবেন।

দ্বিজেনকে ভার দেওয়া হয়েছিল আমাদের সন্দিগ্ধ দাদাটিকে ধরে রাখবে, আর তা ছাড়া পথঘাটের দিকে নজর করে গেটের কাছে সি.আই.ডি-রা রয়েছে কিনা দেখে জোরে গলা-খাঁকারি দিয়ে আমাদের সংকেত দেবে।

রাস্তা ক্লিয়ার হবার জন্য বসে থেকে যে পুরো তিন ঘণ্টা সময় পার হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওপর থেকে সংকেত ভেসে এল আর আমরাও রওনা হলাম।

রাঙাকাকাবাবু পর্দার এপাশে এসে ইলার কাছ থেকে সস্নেহে বিদায় নিলেন, বললেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইলাকে বলা হল, আমরা চলে যাবার পরও অন্তত আরো এক ঘণ্টা রাঙাকাকাবাবুর ঘরের আলো যেন জ্বলতে থাকে।

হোল্ড-অল হাতে অরবিন্দ আগে, তারপর রাঙাকাকাবাবু, পিছনে আমি। তিনজনে করিডরের দেওয়াল ঘেঁষে, পা টিপে টিপে চললাম। সেদিন আকাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, রাঙাকাকাবাবু সাবধান করে দিলেন দেওয়ালে যেন ছায়া না পড়ে।

একেবারে সাইলেন্ট মার্চ করে আমরা পিছনের সিঁড়ি দিয়ে

নেমে গাড়ির কাছে এসে পড়লাম। হোল্ড-অলটা সামনের সীটে রাখা হল। রাঙাকাকাবাবু নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে দরজাটা বন্ধ না করে ধরে রইলেন, যদি কেউ জেগে থাকে তো দুটো দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ যেন শুনতে না পায়, তা হলে সন্দেহ হবে দু'জন লোক বেরিয়ে গেল।

রাঙাকাকাবাবু গিয়ে গাড়িতে বসার পর আমি বেশ আওয়াজ করে চটি জুতো ফটফট করে গাড়িতে উঠলাম ও দরজাও সশব্দে বন্ধ করলাম। আমার এত সব চেষ্টাকৃত গোলমালে দূরে কোথায় কয়েকটা কাক ডেকে উঠল। বাইরের গেটটা অরবিন্দ এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল, আমি যেন তুমুল গর্জন করে গাড়ি চালিয়ে জোরে বেরিয়ে গেলাম।

১৪

দীর্ঘ প্রতীক্ষার এক ফাঁকে রাঙাকাকাবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যেন প্রথমত দক্ষিণমুখো যাই—যদিও আমাদের গন্তব্য উত্তরে। ডান দিকে মোড় নিয়ে তো বাড়ি থেকে বেরোলাম, তারপর এলগিন রোড ছেড়ে আবার ডান দিকে ঘুরে এলেনবি রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগুলাম। আমাদের কাছাকাছি কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হল না। এলগিন রোড ও উডবার্ন রোডের মোড়ে তক্তাপোশ পেতে সি.আই.ডি-র লোকেরা তাদের হেড কোয়ার্টার পেতেছিল। আমরা যখন বেরিয়ে গেলাম, তারা সম্ভবত কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল। দুই রাস্তার মোড়ের ঐ পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা। সেখান থেকে বসু পরিবারের দুটো বাড়ির উপরই নজর রাখা যেত। আর দরকার পড়লে চট করে যে-কোন বাড়ির সামনে উপস্থিত হওয়া যেত। যাই হোক, তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এবং দুই পাখিই তাদের

অজান্তে উড়ে গেল।

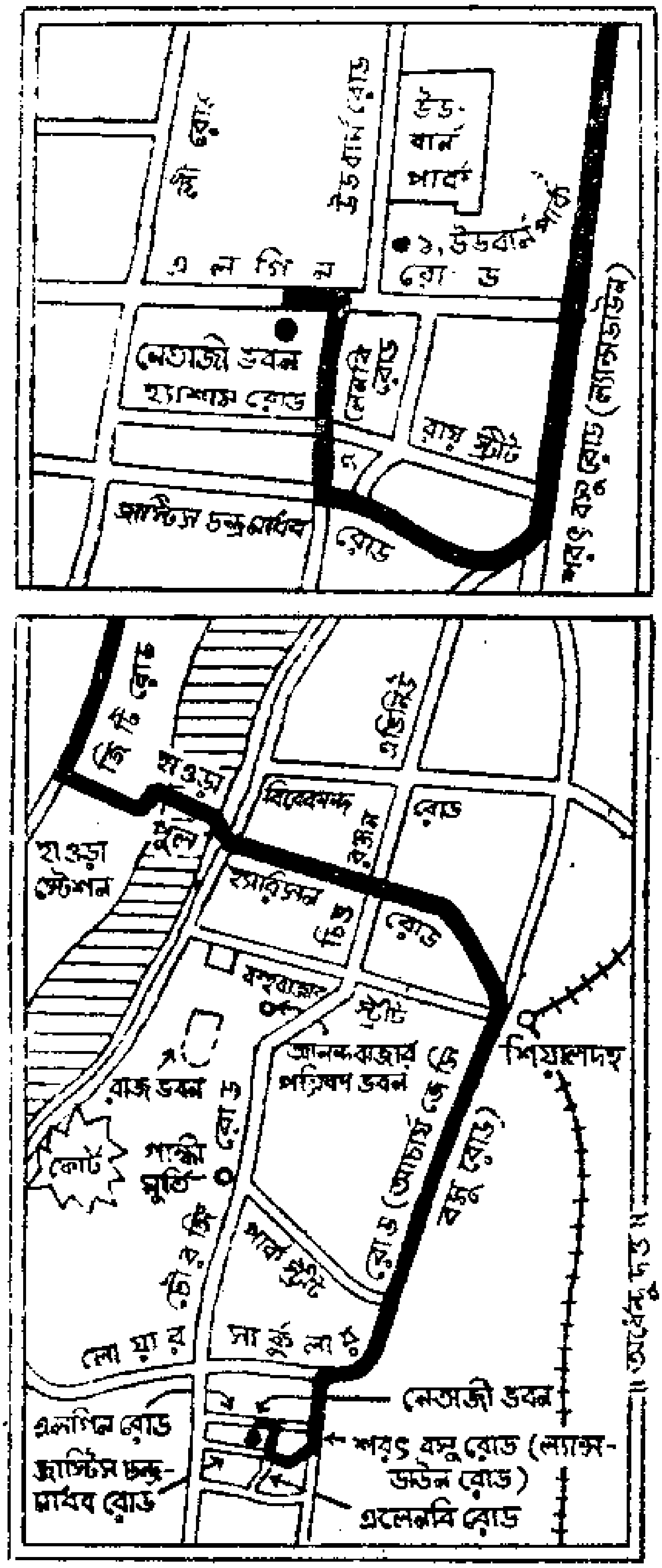
এলেন্‌বি রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড ধরলাম এবং ল্যান্সডাউন রোডে পড়লাম। রাঙাকাকাবাবু সেই যে গাড়ির দরজা ধরে বসেছিলেন, এলেন্‌বি রোডে পড়বার পর দরজাটি বন্ধ করলেন। ল্যান্সডাউন রোড ধরে উত্তরে ঘুরে লোয়ার সার্কুলার রোডে পড়লাম। কিছুক্ষণ ধরে আমি একটু পর পর পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম, কোন গাড়ি আমাদের অনুসরণ করছে কিনা। পিছন দিকে কোন আলো দেখা গেলেই আমি সন্দিগ্ধভাবে দেখছিলাম। রাঙাকাকাবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কেন আমি সন্দিহান হচ্ছি এবং কেউ আমাদের ফলো করছে বলে মনে করছি কিনা।

আমাদের প্ল্যান ছিল সকাল হবার আগেই ধানবাদ পৌঁছাব অথচ রওনা হতেই কত দেরি হয়ে গেল! এতে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এদিকে খুব বেশী স্পীডে গাড়ি চালাবার ঝুঁকিও আমি নিতে চাই না। মনের অস্থিরতায় এবং সময় ও স্পীড সম্বন্ধে মনে মনে একটা প্ল্যান করবার উদ্দেশ্যে আমি একটু পরে পরেই ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে টর্চের আলো ফেলে সময় দেখছিলাম। লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে এসে শেয়ালদার কাছে গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে হল। কারণ এক ঝাঁক ঘোড়ার গাড়ি রাস্তার এ-পাশ ও-পাশ ঘোরাঘুরি করছিল। এরা আমাদের আরও দেরি করিয়ে দেবে—এই কথা বলতে বলতে আমি আর একবার টর্চের আলো ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে ফেললাম। রাঙা-কাকাবাবু আমাকে সাবধান করলেন, 'টর্চের আলো ওভাবে ফেলো না, ড্যাশবোর্ড থেকে আলো এসে আমার মুখে পড়ছে।'

হ্যারিসন রোড ধরে এগিয়ে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পারলাম সারা কলকাতা ঘুমুচ্ছে—আর ভয়ের কারণ নেই, শুধু হাওড়া ব্রিজের কাছে এসে গোটা দুয়েক ট্যাক্সি আর কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি আবার চোখে পড়ল।

তখনকার দিনেও গঙ্গা নদী পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়তে

হলে দুটো ব্রিজ ছিল—হাওড়া ব্রিজ ও দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে উইলিংডন বা বালী ব্রিজ। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে গিয়ে



বালী ব্রিজের দ্বিতীয় রাস্তাটি বেশ ভাল ছিল এবং আমরা সাধারণত রিষড়ার বাড়ি যেতে ঐটিই ব্যবহার করতাম, কিন্তু ব্রিজ পার হতে টোলের পয়সা দিতে হত। পয়সা নিতে টোলের লোকেরা বড় কাছে আসত। কি জানি যদি চিনে ফেলে, তাই ঐ ব্রিজ দিয়ে যে যাব না, আগেই আলোচনা করে ঠিক করা ছিল। হাওড়া ব্রিজ পার হবার সময় ও তারপরে হাওড়ার এবড়োখেবড়ো রাস্তা

দিয়ে যাবার সময় গাড়িটা যেন বড্ড বেশী আওয়াজ করতে লাগল, নিঝুম রাতে গাড়ির এই আওয়াজে আমার অস্বস্তি হতে লাগল—কেউ যেন শুনে ফেলবে। শিল্প-এলাকা পার হবার সময় পথে মাঝে-মধ্যে সশস্ত্র পুলিশও চোখে পড়ল। তারা আমাদের চলন্ত গাড়ির দিকে নির্লিপ্তভাবে চেয়ে দেখল। চেনা জায়গাগুলি পার হবার সময় আমরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছিলাম—এই লিলুয়া পার হলাম—উত্তরপাড়া, বালী, কোন্নগর—এবার আমাদের রিষড়া, এই শ্রীরামপুর ইত্যাদি।

ঘণ্টা খানেক ড্রাইভ করার পর আমি রাঙাকাকাবাবুকে বললাম, 'আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন না!' রাঙাকাকাবাবু বললেন, 'না। সেটা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। গাড়ির একমাত্র আরোহী যদি ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে যে ড্রাইভ করছে, তারও ক্লান্তি এসে যায়। তার চাইতে চালকের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে তাকে সঙ্গ দেওয়া উচিত।' তিনি এই সূত্রে তাঁর কতকগুলি মোটরে করে লম্বা লম্বা ট্যুরের কথা বললেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, রাত জেগে মোটরে ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস আছে।

আসবার সময় ইলা থার্মোফ্লাস্ক ভরে কফি দিয়েছিল। রাঙাকাকাবাবু মাঝে মাঝে আমাকে কফি অফার করতে লাগলেন। এমন কি, যখন আমি লেভেল ক্রসিং-এ গাড়ি থামিয়েছি, কাপে কফি ঢেলে আমার মুখের কাছে ধরে রইলেন। কি আর করব! ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে খেলাম।

সেই দীর্ঘ পথ পার হতে মাঝে মাঝে টুকিটাকি নানারকম কথাবার্তা হয়েছিল। হঠাৎ একবার রাঙাকাকাবাবু বললেন, 'ডি ভ্যালেরার এস্‌কেপের গল্প জানো তো?'

বললাম, জানি। সেই কেকের ওপর চাবির ছাপ দিয়ে জেলের ভেতর পাচার করে দেওয়া—তারপর সেই ছাপ থেকে চাবি তৈরি করে নেওয়ার কাহিনী তো? আমি আবার শেষের ক'দিনে কতকগুলি বিখ্যাত এস্‌কেপের কাহিনী পড়ে নিয়েছিলাম।

রাঙাকাকাবাবু হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, 'জানো,

আজ রাত্রে বেরিয়ে পড়ার প্ল্যান আমি আর একটু হলে বাতিল করে দিতাম।' পরিবারের কয়েকজনের মনে ওঁর গতিবিধি যে সন্দেহজনক ঠেকেছে তাতেই উনি এ কথা ভেবেছিলেন। বললেন, 'দেখ, এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয় জানো? যখন এমন পরিস্থিতি হয় যে, কারুর মনে গভীর সন্দেহ জেগেছে, যাকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই এবং যে অন্যথায় সন্দেহ ছড়িয়ে দিয়ে আরও ক্ষতি করতে পারে। তাকে খানিকটা বলে নিজের দলে নিয়ে নিতে হয়, তা হলে সে মুখ বন্ধ করে থাকে। কিন্তু এই পলিসি মেনে চলার একটা সীমা আছে। আমি ইতিমধ্যেই একাধিকবার এরকম করতে বাধ্য হয়েছি এবং সামনে অনেক রাস্তা পড়ে রয়েছে। একটি লোককে সিক্রেট্‌টি বলার আগে অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়—তার বন্ধু-বান্ধব, জীবনযাত্রার ধরনধারণ ইত্যাদি। বাড়ির আর একজনকেও আর এর মধ্যে জড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে কিছুই গোপন থাকে না।'

রাঙাকাকাবাবু আরও বলে দিলেন—'তুমি রোজ সন্ধ্যাবেলা যেমন এলগিন রোডের বাড়িতে যাও ঠিক সেইরকম যাতায়াত বজায় রাখবে।' আমি কলকাতায় ফিরবার পর বাবাও আমাকে একই উপদেশ দিয়েছিলেন। যারা এই গোপন গৃহত্যাগের কথা জানে, রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তাদের যেন ফিরে এসে বারে বারে বলি ব্যাপারটার গোপনতা রক্ষা করে চলতে। ইংরেজীতে তিনি বলতেন—They must keep their mouth shut.

আবার আমাদের আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধব গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকজনের নাম করে তাদের সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক থাকতে বললেন।

বর্ধমানের পথে একটি রেলের বন্ধ লেভেল ক্রসিং-এ আমি হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষতে এক ঝলক পেট্রল বেশী এসে পড়াতে এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। রাঙাকাকাবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আমি ওঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, দু-এক মিনিট অপেক্ষা করলে ঠিক হয়ে যাবে। উনি তখন আমার জন্য কফি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গাড়ি যথারীতি স্টার্ট নিল। ট্রেনও তো অনেকক্ষণ চলে গেছে, কিন্তু লেভেল ক্রসিং-এর গেট আর খোলে না। শীতের রাতে লোকটি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ধাক্কাধাক্কি ও বিরাট হাঁকডাক আরম্ভ করলাম এবং লোকটিকে প্রায় টেনে বার করলাম। রাঙাকাকাবাবু অপরিচিত লোকের এত কাছে যাওয়া ও কথাবার্তা বলা মোটেই পছন্দ করলেন না।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে পরদিনের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বারারিতে পৌঁছে উনি বাড়িতে কিভাবে ঢুকবেন আর ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট হিসাবে কি অভিনয় করবেন তা আমাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের আকস্মিক আগমনের কথা আমার দাদা কিছু জানতেন না। তাই পৌঁছেই আমি দাদাকে কি বলব তা পাখি পড়ার মত বারবার আমাকে শিখিয়ে দিলেন।

আগে কথা হয়েছিল, বারারি পৌঁছে আমি বাবাকে টেলিগ্রাম করব—Boudidi better, no cause for anxiety, রাঙাকাকাবাবু একটু ভেবে নিয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করতে বারণ করলেন। উনি বললেন, এতে মিছামিছি গভর্নমেণ্টের কাছে একটা রেকর্ড থেকে যাবে যে, আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, তা ছাড়া বাড়ির লোকজন অনেকে হয়ত আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্যই করবে না; তাদের অকারণ সজাগ করে দিয়ে কি লাভ!

আমি মোটের উপর মাঝারি স্পীড বজায় রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বেশ আঁকাবাঁকা। রাঙাকাকাবাবু তাঁর আরও অনেক লঙ ডিস্ট্যান্স্ ট্যুরের কথা—পাঞ্জাব, ইউ পি অথবা পশ্চিম ভারতে—একটু-আধটু বলছিলেন। দেরি করে রওনা হবার ফলে পৌঁছতেও দেরি হয়ে যাবে এই কথা ভেবে আমরা দু'জনেই ব্যস্ত হচ্ছিলাম। আমি মাঝে মাঝে এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে পথের পাশের মাইল-স্টোনগুলো দেখে নিচ্ছিলাম। গাড়ির

মাইলের মিটার ঠিক কাজ করছিল না।

বর্ধমান পৌঁছতে প্রায় রাত চারটে হল। ঘুমন্ত শহর ও রেল-স্টেশন। আমি রাঙাকাকাবাবুকে দেখালাম। বর্ধমানের পর রাস্তাটা সোজা হয়ে এল, আমি স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। গাড়িটাও যতই গরম হল, ততই যেন ভাল চলতে লাগল। যখন ডাকাতির জন্য কুখ্যাত দুর্গাপুরের জঙ্গল পার হয়ে এলাম, তখন ল্যাণ্ডস্কেপের চেহারা পালটে গেল—লাল মাটি ও সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী। চারিদিক চাঁদের আলোয় যেন ভেসে যাচ্ছে। জীবনের প্রথম বড় অ্যাড-ভেঞ্চার করতে বেরিয়েছি—আমার পক্ষে খুবই রোমান্টিক পটভূমি। বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি—ডাকাত নয়, এক পাল মোষ রাস্তা পার হচ্ছে। ব্রেক কষতে গাড়িটা কর্কশ আওয়াজ করে থামল। আর একটু হলেই মোষের দলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত। মোষগুলো ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর রাস্তা থেকে নেমে গেল। আমার বুক ধকধক করছিল। আড়চোখে রাঙাকাকাবাবুর দিকে তাকালাম। দেখি, উনি শান্ত ও অবিচলিত রয়েছেন। তখন আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

আসানসোলের কাছাকাছি যখন এলাম, সবে ভোর হয়ে আসছে, —চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন, শহরের একটু বাইরে একটা পেট্রল স্টেশন দেখতে পেয়ে আমি পেট্রল ভরে নিতে চাইলাম। রাঙা-কাকাবাবু এটা একেবারেই পছন্দ করলেন না। পেট্রল ভরতি টিনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'না নিলেই নয়?' আমি বললাম, 'একটা টিন রিজার্ভ থাকা ভাল, কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।' কেউ তাঁকে দেখে ফেলে এটা রাঙাকাকাবাবু চাইছিলেন না। আমি এমনভাবে গাড়ি রাখলাম যাতে যে-লোকটি পেট্রল দিচ্ছে সে গাড়ির পিছন দিকে থাকে। যতক্ষণ পেট্রল দিল তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলে তার দৃষ্টি আমার দিকে ধরে রাখলাম। আসানসোল শহর যত তাড়াতাড়ি পারি পার হয়ে এলাম।

আসানসোল থেকে ধানবাদের পথে খটখটে সকালবেলার রোদ্দুরে ড্রাইভ করতে হল। এই প্রথম আমার মনে হল, রাঙা-কাকাবাবুর ছদ্মবেশটা সত্যিই ভাল। রাস্তা সোজা কিন্তু উঁচুনীচু—সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের মত। যখন নীচের দিকে আছি দূরের রাস্তা আর দেখা যায় না। গাড়ি নিয়ে লুকোচুরি খেলার মত মনে হয়। গাড়িঘোড়া কিছু কিছু চলতে আরম্ভ করেছে। উল্টো দিক থেকে কয়েকটা গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সকাল হতেই আমি রাঙাকাকাবাবুর সেই কাশ্মীরী টুপিটা মাথায় পরেছিলাম। এতে আমার মনে একটু নিরাপত্তার ভাব এসেছিল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রাস্তা যেখানে ধানবাদের দিকে বেঁকে গিয়েছে তার কিছু আগে গোবিন্দপুর নামে গ্রামে একটা চেকপোস্ট ছিল। আমি যখন ড্রাইভ করে আসছি, দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে বাঁশের গেটটি পথ বন্ধ করে নেমে আসছে। আমি গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। একটি লোক পাশের ছোট ছাউনি থেকে পেন্‌সিল আর নোটবই হাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। তার পরই আবার লোকটি সরে গেল, গেটও উপরে উঠে গেল। আমি স্পীড দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। রাঙাকাকাবাবুকে বললাম, 'আমার গাড়ির নম্বর নিল।' মনে হল তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। অন্তত তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঠিক দেখেছো? নম্বর নিয়েছে?' আমি ওঁকে আশ্বস্ত করলাম যে, এটা একটা রুটিন ব্যাপার। ক'দিন আগে এ পথ দিয়ে যেতে আমি এটা লক্ষ্য করেছিলাম।

দিনের আলোয় ধানবাদ শহরের মধ্য দিয়ে যেতে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল এবং যতটা পারি জোরে চালাচ্ছিলাম। চেনা শহর, যদি আমাদের কেউ দেখে ফেলে! ধানবাদ ছেড়ে বারারির পথ ধরলাম। এলাকাটা অবশ্য আমি ভাল করে ক'দিন আগেই দেখে গিয়েছি। তা সত্ত্বেও রাস্তা যদি ভুল করি এই ভয় মনে মনে ছিল। আমি অধীরভাবে কতক্ষণে বারারিতে দাদার

বাড়ি দেখতে পাব আশায় প্রত্যেকটি মোড় গুনতে লাগলাম। যখন দূর থেকে বারারির বাড়ি ও তার পিছনে কোক্ ওভেন প্লাণ্টের প্রকাণ্ড চিমনি দেখা গেল, আমি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমি দূর থেকে তাঁকে বাড়িটা ঠিক চিনিয়ে দিতে পারব কিনা, রাঙাকাকাবাবু বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। পাশাপাশি ঠিক এক ধরনের দু'টি বাড়ি ছিল, একটি আমার দাদার, আর অন্যটি ঐ একই কারখানার একটি ইংরাজ অফিসারের। ভুল হলে আর নিস্তার নেই।

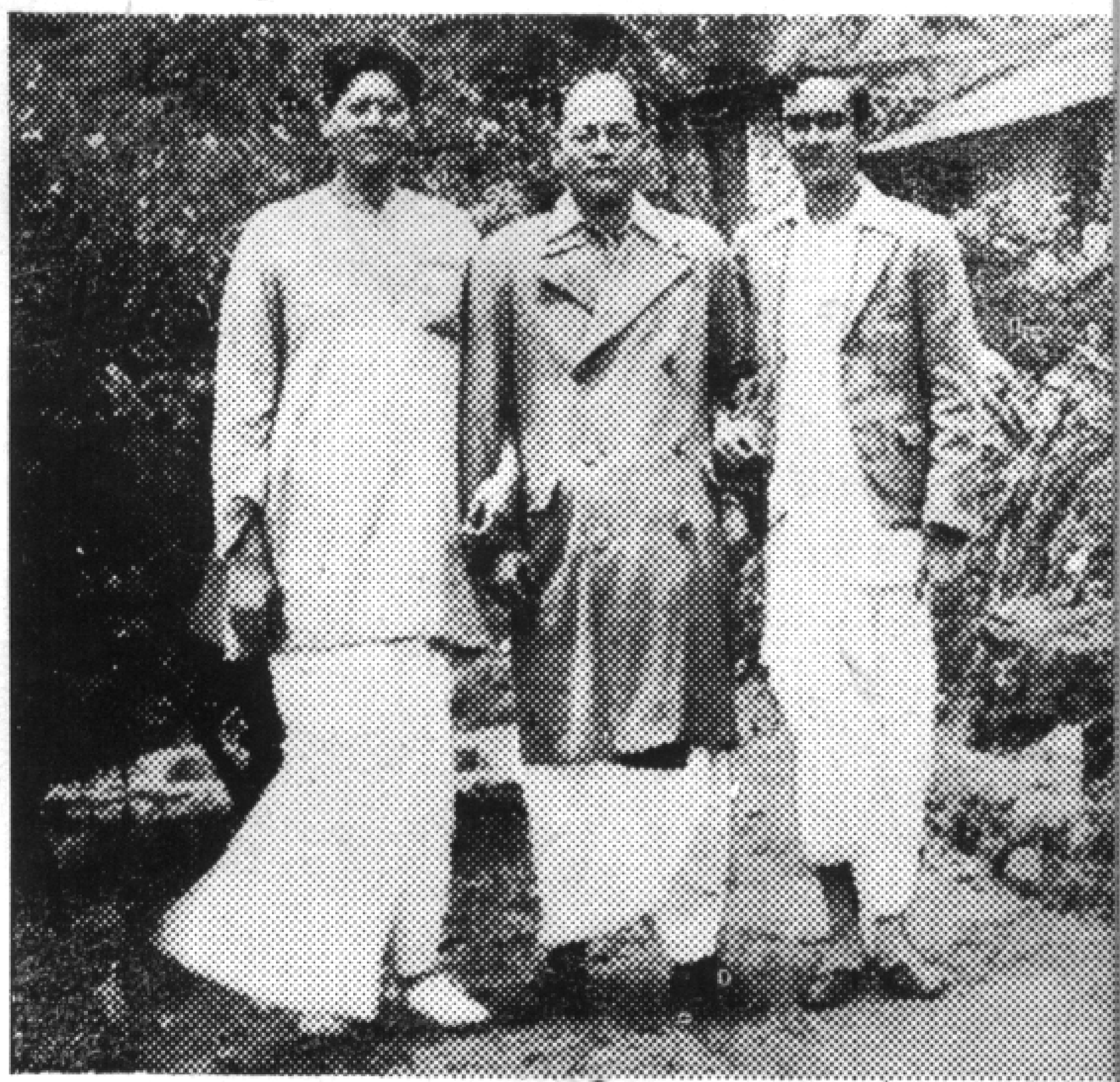
তখন সকাল সাড়ে আটটা হবে। কথা ছিল দাদার বাড়ির কিছু দূরে আমি রাঙাকাকাবাবুকে নামিয়ে দেবো। ওঁকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে আমি একাই ড্রাইভ করে বাড়িতে ঢুকব। যতটা দূরে রাঙাকাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে যাবেন, আমি মনে করেছিলাম ও চেয়েছিলাম, ততটা দূরে তিনি নামলেন না। আমি বাড়ি ঠিক চিনিয়ে দিয়েছি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পর বাড়ি থেকে চার শ' গজ মত দূরে আমি গাড়ি একবার দাঁড় করালাম ও রাঙাকাকাবাবু নেমে পড়লেন।

১৫

আমি বেশ সহজভাবে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গাড়ি ড্রাইভ করে দাদার বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়ির সামনেই দু'জন লোক কাজ করছিল। তার মধ্যে একজন দাদার ড্রাইভার। অন্তত দু'জন লোক দেখল যে, আমি একা গাড়ি করে এসে ঢুকলাম, এতে আমি খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। আমার ছোট স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে আমি একরকম দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলাম। হাতে মাত্র মিনিট দশেক সময় আছে। তার মধ্যে দাদাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। রাঙাকাকাবাবুর দুটো বাক্স গাড়ির পেছনের লাগেজ বুথে ছিল, সেখানেই রইল। হোল্ড-অলটি সীটের



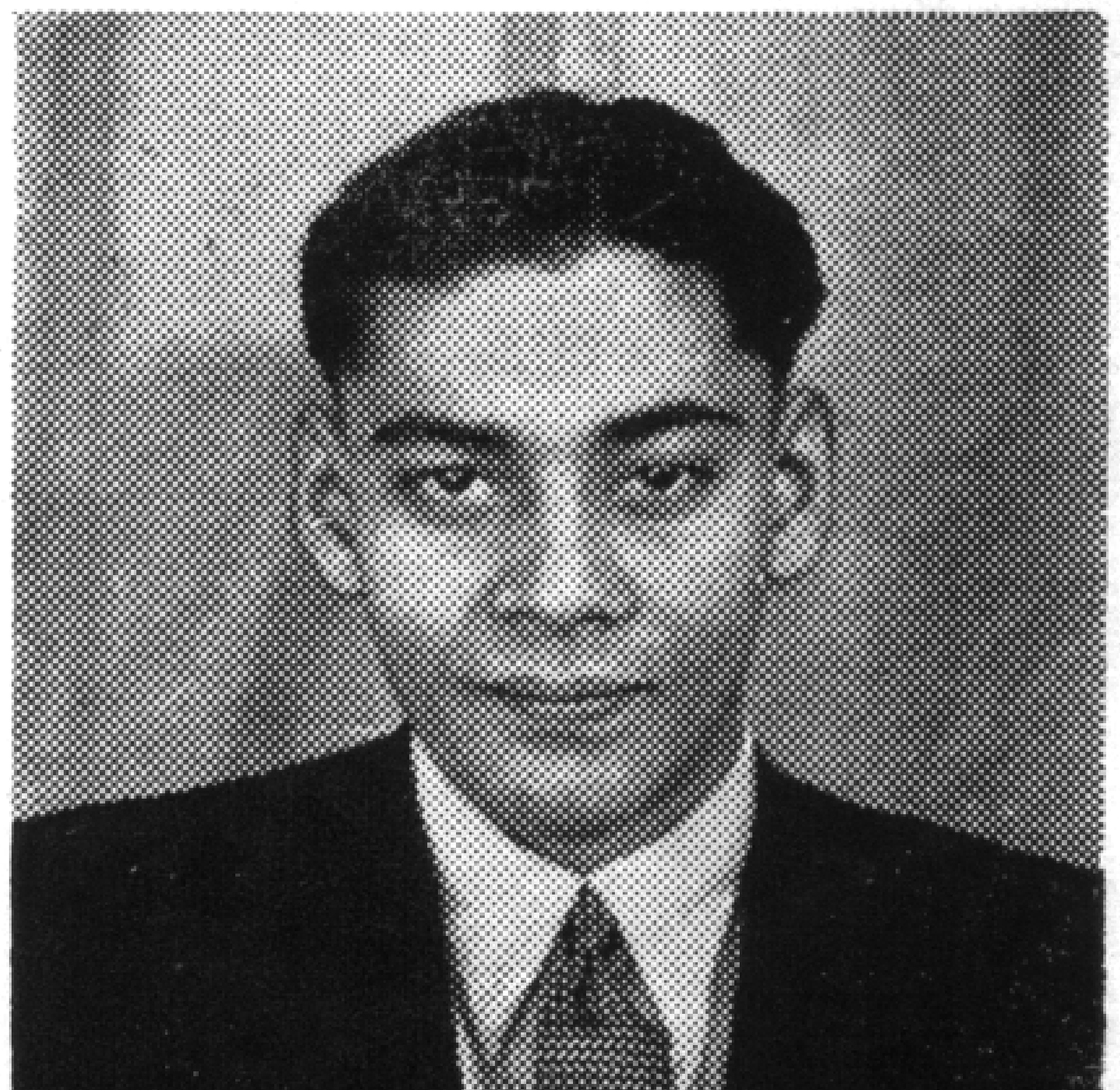
ভগৎরাম



অমিয়নাথ, সুভাষচন্দ্র ও শিশির (কার্শিয়ং ১৯৩৬)



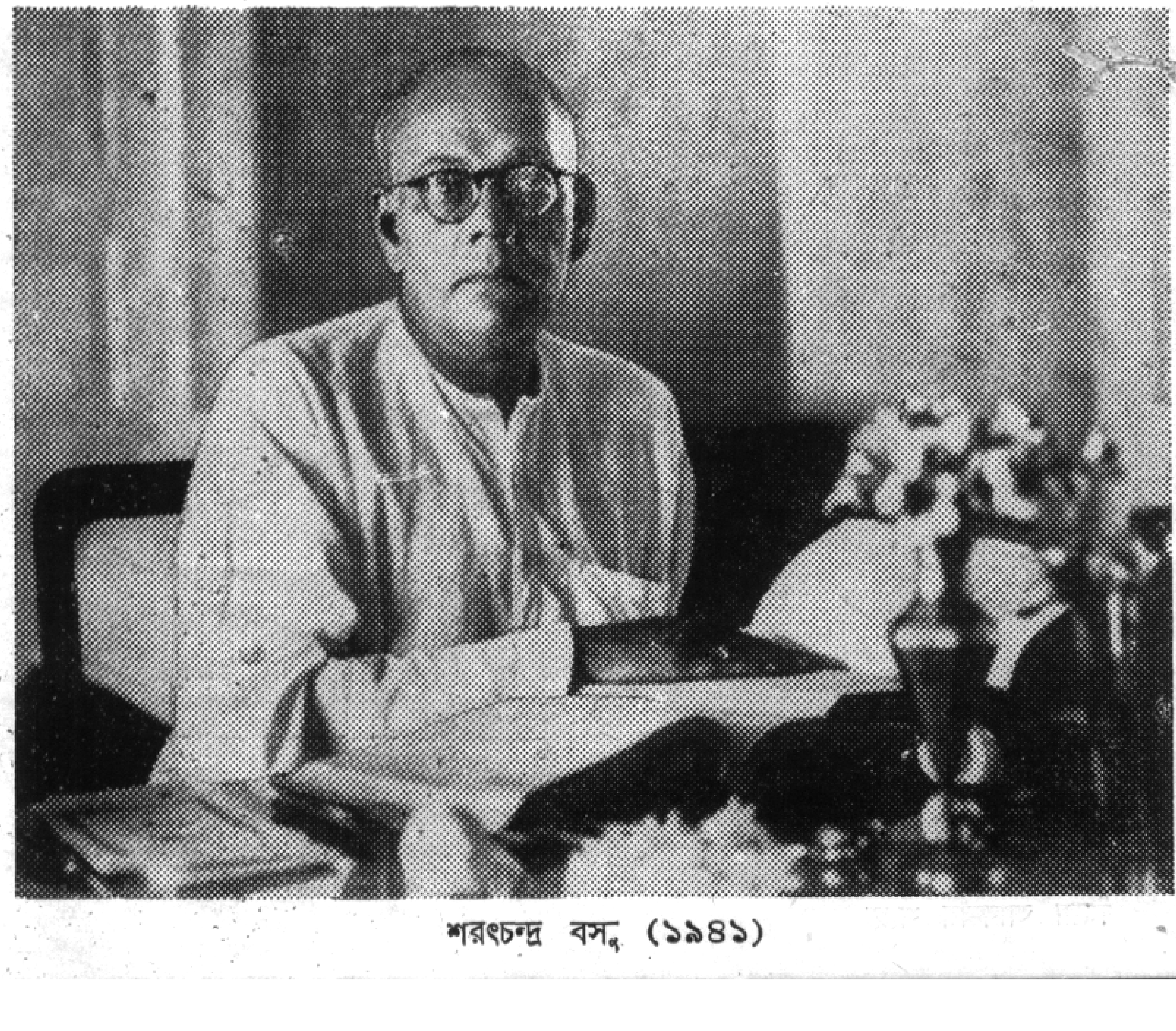
মিয়া আকবর শাহ



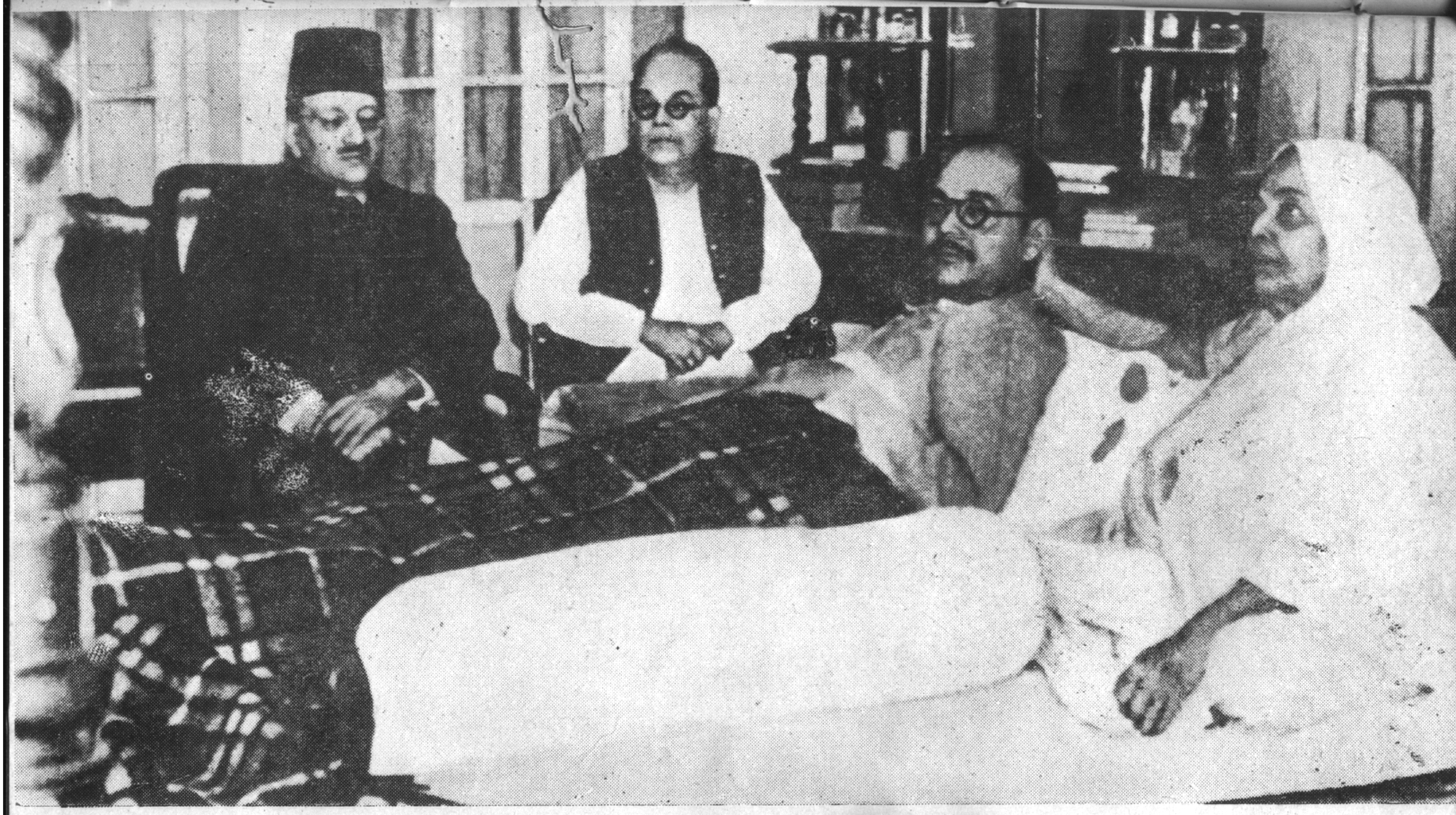
অশোকনাথ বসু (১৯৪১)



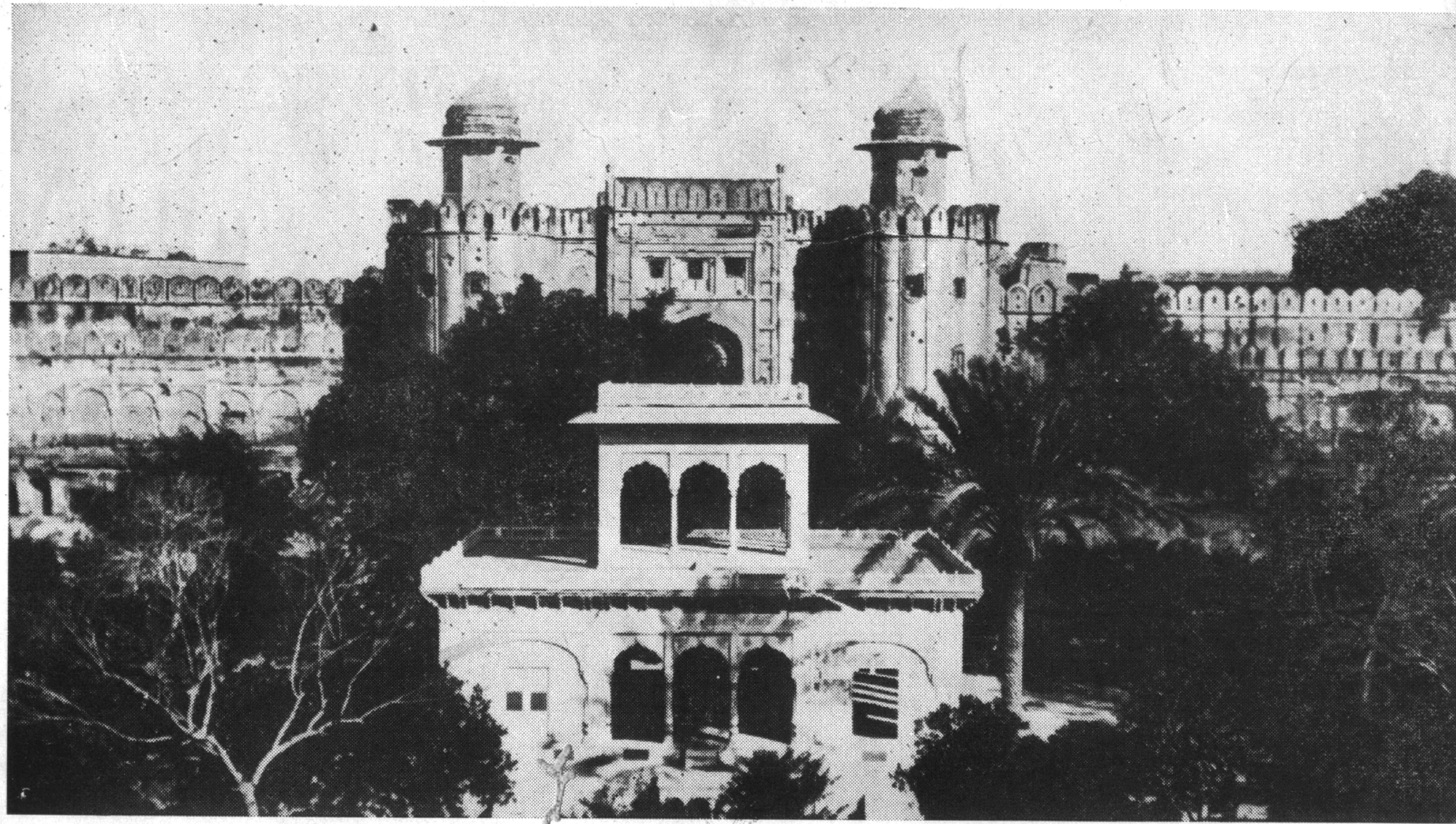
ইলা (১৯৪১)



শরৎচন্দ্র বসু (১৯৪১)



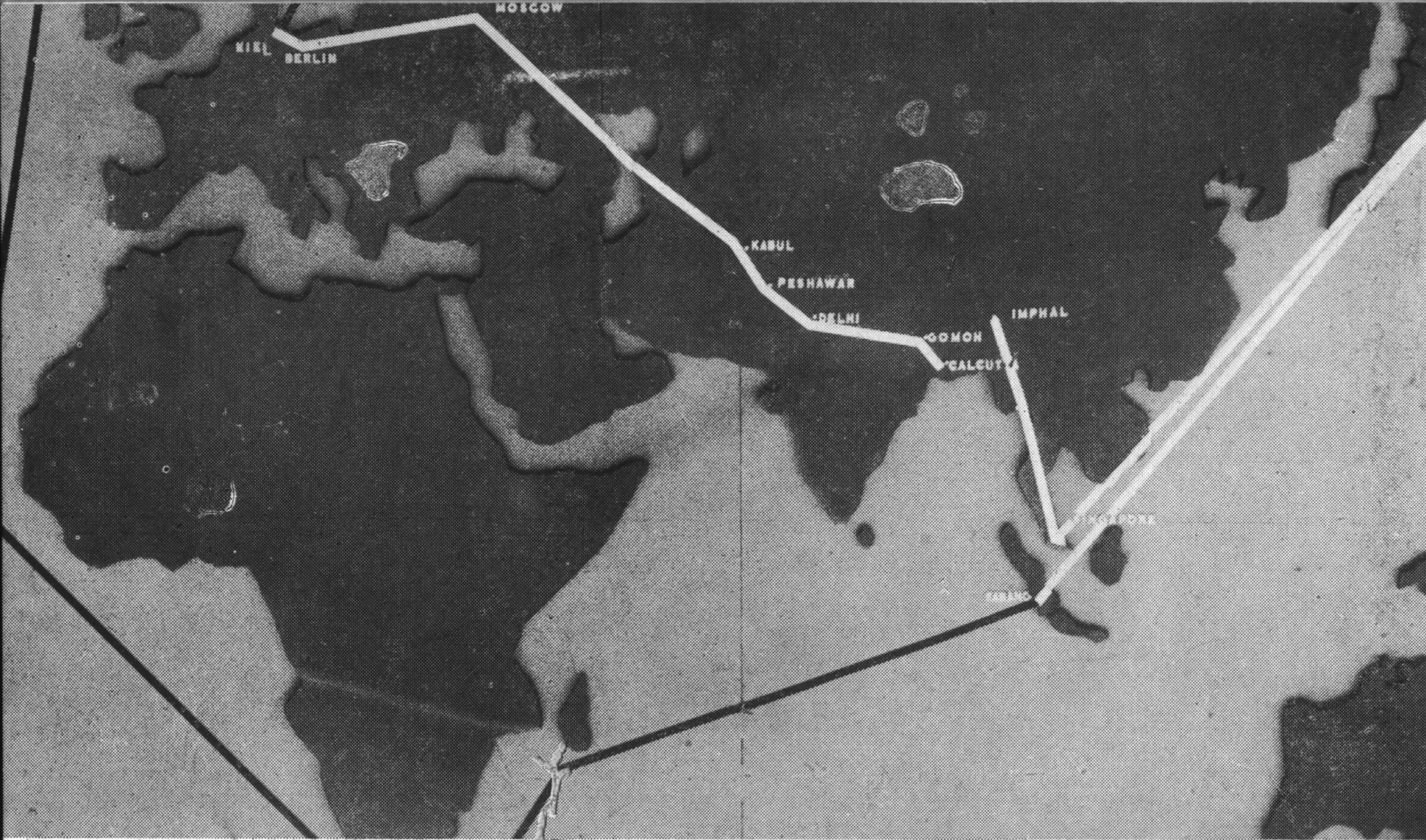
মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মাজননী, মেয়র সিদ্দিকী ও সতীশচন্দ্র বসু

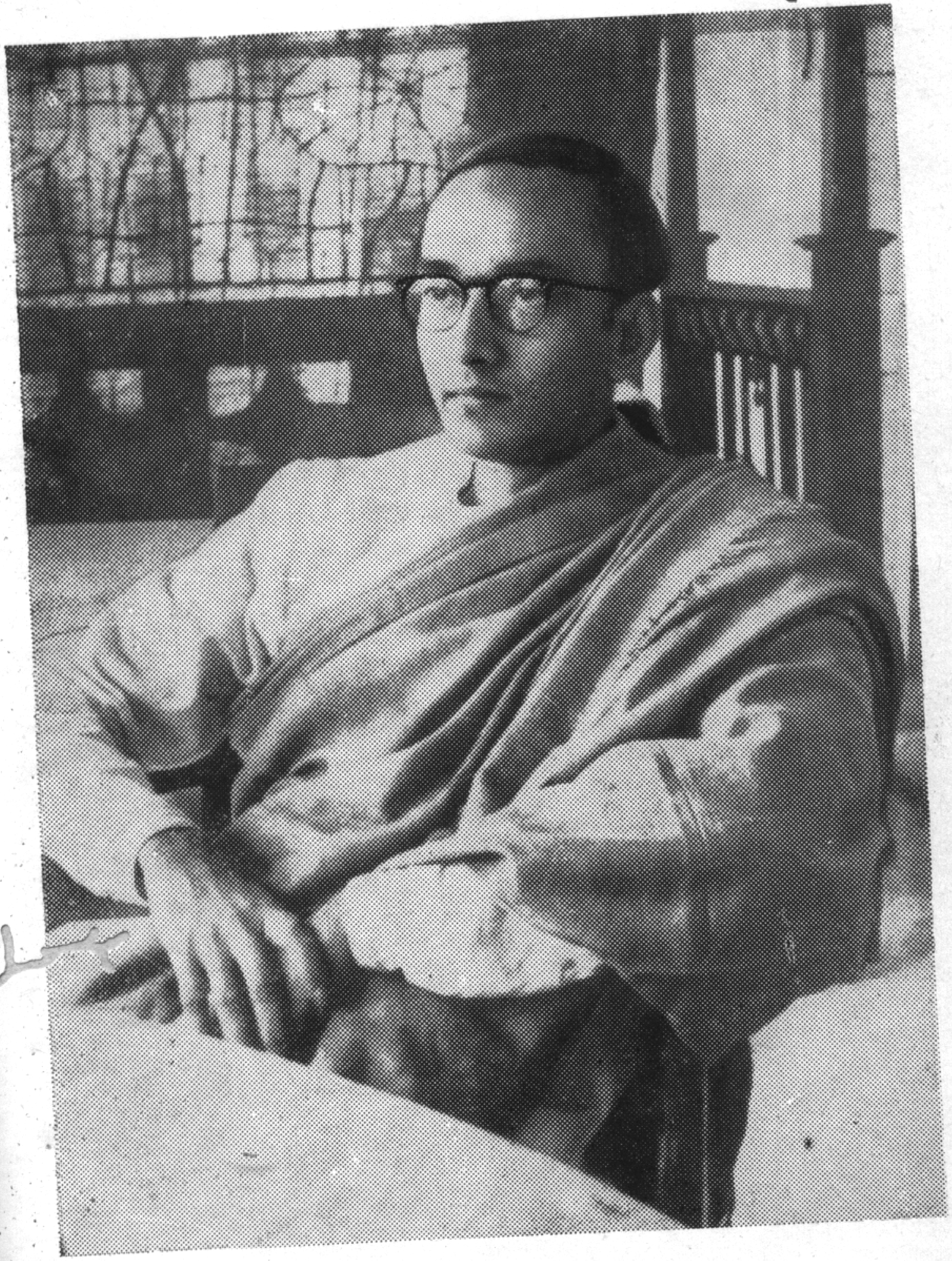


লাহোর ফোর্ট



গাড়ীটি যেখানে ছিল এবং যেখান থেকে নেতাজী গাড়ীতে ওঠেন।


MOSCOW
KIEL
BERLIN
KABUL
PESHAWAR
DELHI
GOMOH
IMPHAL



শিশিরকুমার বসু ১৯৪১

উপর ছেড়ে এলাম। গাড়ি গ্যারাজে ঢোকাবার আগে ড্রাইভার সেটা আমার মনে করে ভিতরে দিয়ে গেল। দাদা শোবার ঘরে ছিলেন। আমি দরজায় নক্ করছি, বেশ জোরে নক্ করছি, আমার মনে হল বহুক্ষণ যেন কোন সাড়া নেই। মনে হল সব কথা বুঝিয়ে বলার আগেই রাঙাকাকাবাবু হয়ত এসে পৌঁছে যাবেন। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। এমন সময় দরজা খুলে দাদা আমাকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন—যদিও আমি যে আসতে পারি তার ইঙ্গিত ওঁকে আগের বার দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কোনমতে দাদাকে রাঙাকাকাবাবু যা বলতে বলেছিলেন বলে গেলাম। বললাম, রাঙাকাকাবাবুকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি একটা বিশেষ গোপন মিশনে যাচ্ছেন, ছদ্মবেশে এসেছেন। আমি ওঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে এসেছি যাতে আমরা একসঙ্গে এসেছি তা কেউ জানতে না পারে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু এসে পড়বেন। উনি বলবেন যে, উনি একজন ইন্সিওরেন্স এজেন্ট এবং দাদার সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলতে চান। দাদাকে বলতে হবে যে, এখন ওঁর কাজে বার হবার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই কথাবার্তা বলার সুবিধা হবে না। তখন রাঙাকাকাবাবু বলবেন, অনেক দূর থেকে আসছেন। কাছাকাছি থাকবার জায়গা নেই এবং ফেরবার ট্রেনও রাত্রের সার্ভিস নেই, অতএব তার চাইতে উনি না-হয় অপেক্ষা করবেন, পরে কথাবার্তা হবে। আজকের দিনের মত উনি দাদার আতিথ্য ভিক্ষা করবেন। এই সব কথাবার্তা ইংরেজিতে হবে এবং এমন করে হবে যাতে ভৃত্যরা সব শুনতে পায়। রাত্রির প্ল্যান নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।

আমার বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ভৃত্য এসে খবর দিল একজন অপরিচিত পরদেশী লোক দাদার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমি এমন ভাব দেখালাম যেন এতে আমার কোনও উৎসাহ নেই। আমি বউদিদির খোঁজে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

দাদা বারান্দায় বেরিয়ে 'অপরিচিত' আগন্তুকের সঙ্গে যথাবিহিত কথাবার্তা বললেন। তারপর অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে বসবার ঘরে এলেন। ভৃত্যকে ডেকে দাদা বলে দিলেন যে, ইনি আজকের দিনটা থাকবেন, বাড়তি শোবার ঘরটায় ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এঁর খাওয়াদাওয়া ওঁর ঘরেই পাঠিয়ে দিলে হবে।

সেই ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১-এর সারা দিন ধরে আমরা যে স্টেজ অ্যাক্‌টিং করে গেলাম সে একটা আলাদা করে বলার মত গল্প। দাদা যখন ভৃত্যকে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন আমি খুব নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকলাম। দাদা অমনি অপরিচিত আগন্তুকের সঙ্গে আমার 'পরিচয়' করিয়ে দিয়ে বললেন—এটি আমার ভাই শিশির বোস।

অতিথিকে বসবার ঘরেই চা খেতে দেওয়া হল। আমি দাদা ও বউদিদির সঙ্গে ভেতরে খাবার ঘরে খেতে বসলাম। দাদা তারপরেই কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি বউদিদির সঙ্গে গল্পগুজব করে খানিক সময় কাটালাম। তারপর বিশ্রাম করলাম। রাঙা-কাকাবাবু তাঁর ঘরেই ছিলেন।

দুপুরে খেতে দাদা বাড়ি এলেন। বাইরের লোককে যেমন দেওয়া হয়ে থাকে—রাঙাকাকাবাবুর খাবার ওঁর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমরা সকলে মিলে খেলাম। দাদা অতিথির সঙ্গে আর দেখা করলেন না। তখনই কাজে চলে গেলেন। আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পেট্রল ভরে নিলাম।

বাইরে থেকে বুঝতে পারলাম, রাঙাকাকাবাবু দুপুরবেলা বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেন। বিকেলের আগে ঘর থেকে বার হলেন না।

দাদা কাজ থেকে ফিরলে বেয়ারার মারফত উনি খবর পাঠালেন যে, এবার একটু কথা বলতে চান। দাদা ও রাঙা-কাকাবাবু বাইরে বারান্দায় কথাবার্তা বললেন। আমি বসবার ঘরে বসে নির্লিপ্তভাবে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলাম। রাঙাকাকাবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আসানসোল নয়, উনি গোমো

থেকে ট্রেন ধরবেন। আমি যখন এ কথা শুনলাম, আমি বললাম যে, এখান থেকে গোমোর রাস্তা আমার অচেনা, তায় রাত্রে গাড়ি ড্রাইভ করব—আরও অসুবিধা হবে। দাদা সঙ্গে এলে ভাল হয়। রাঙাকাকাবাবু রাজী হলেন, কিন্তু দাদা বললেন, এসব জায়গায় রাত্রে বউদিদিকে একা ফেলে যাওয়া নিরাপদ নয়। রাঙাকাকাবাবু বললেন—ঠিক আছে, উনিও সঙ্গে যাবেন। কেবল ভৃত্যদের ডেকে বলে দেওয়া হল বাইরের ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে, কারণ, ওঁকে ট্রেন ধরতে হবে। আমরাও একটু আগে আগে খাওয়া সেরে নিলাম। লোকজনদের বলা হল আমাকে নিয়ে দাদা-বউদিদি বেড়াতে বার হবেন।

শীতের সন্ধ্যা যখন গাঢ় হয়ে এল রাঙাকাকাবাবু সব ভৃত্যদের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ লোক দেখানোভাবে আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজীতেই বিদায় সম্ভাষণ হল। কথা ছিল—উনি যে পথে এসেছেন সে-পথে কিছু দূর গিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমরা তিনজন একটু পরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে মোটেই আলো নেই। রাঙাকাকাবাবু টর্চের সাহায্যে এগোচ্ছিলেন। কিছু দূর গিয়েই অস্পষ্টভাবে তাঁর ছদ্মবেশী চেহারা চোখে পড়ল। তাঁকে আমরা গাড়িতে তুলে নিলাম।

১৬

দাদা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন আর আমি গোমোর দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। ওঁরা তিনজনেই পিছনের সীটে বসেছিলাম, আমার সঙ্গী ছিল আমার পাশের সীটে রাঙাকাকাবাবুর হোল্ড-অল্। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। দিল্লী-কালকা মেল মধ্যরাত্রির পর গোমো স্টেশনে আসে। আমাদের যেতে হবে মাত্র ত্রিশ মাইল। আমরা ধীরে-সুস্থে চলেছিলাম।

রাস্তা অবশ্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত অত ভাল নয়, সরু রাস্তা আর এবড়োখেবড়ো।

পথে আমরা দু'বার বেশ দীর্ঘ সময় থামলাম। একবার রাস্তার এক পাশে গাছের নীচে। বেশ একসার গরুর গাড়ি টুংটাং আওয়াজ তুলে যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে দেখতে লাগলাম। সমসাময়িক ইতিহাসের একটা বিরাট 'অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি হিসাবে এই গরুর গলার ঘণ্টার টুংটাং সঙ্গীতের মূর্ছনা কেমন যেন আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল।

দ্বিতীয়বার থামলাম গোমোর কাছাকাছি। চারিদিকে ধানের ক্ষেত চাঁদের আলোয় যেন ভেসে যাচ্ছে। অদূরে দিগন্তের গায়ে পরেশনাথ পাহাড়ের আবছা রূপরেখা।

গোমো স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তাটা আরো খারাপ। স্টেশন-চত্বরে যখন পৌঁছলাম ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়েছে। দাদা আর আমি মালপত্র—হোল্ড-অল্, স্যুটকেস আর অ্যাটাচি কেস—নামিয়ে, নিয়ে কুলির জন্য হাঁকডাক করতে লাগলাম। একজন ঘুমন্ত চেহারার কুলি এসে মালগুলো তুলে নিল।

'আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও'—বিদায়-মুহূর্তে এই ছিল তাঁর শেষ কথা। আমি কেমন যেন নির্বাক্ ও নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রণাম করার কথাও মনে এল না। রাত্রের গোমো স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজ দিয়ে রাঙাকাকাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত অথচ ধীর ভঙ্গীতে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আগে আগে চলেছে কুলি মাথায় মালপত্র নিয়ে—চিরদিনের মত এই ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রইল। ওপারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাঙাকাকা-বাবু প্ল্যাটফরমের দিকে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে মেল ট্রেনের গুম্‌গুম্ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা গাড়ি নিয়ে একটু দূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেন এসে থামল ও আবার ছেড়ে দিল। আমরা কান পেতে ট্রেনের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। তারপর ট্রেনের চাকার ছন্দোময় ঝঙ্কারের সঙ্গে অন্ধকারের বুকে একটা আলোর

মালা দুলে দুলে দূরে চলে গেল দেখতে পেলাম।

১৭

আমরা যখন বারারিতে এসে পেঁ ৗছলাম রাত তখন তিনটে। আমরা শুয়ে পড়লাম।

দাদা আমাকে বলছিলেন যে, মনে হয় রাঙাকাকাবাবু যেন পুরোনো ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐতিহ্য ও পথ অনুসরণ করছেন, বোধ করি উনি রাশিয়া চলেছেন। আমি দাদার সঙ্গে একমত হলাম যে, রাঙাকাকাবাবু বিপ্লবীদের পথে চলেছেন। কিন্তু আমি বললাম যে, আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ওঁর বর্তমান গন্তব্যস্থল জার্মানী।

পরদিন শনিবার ১৮ই জানুয়ারী সকাল ৯টা নাগাত আমি কলকাতার পথে রওনা হলাম। এবারকার ড্রাইভ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমার জীবনে আমি এত নিশ্চিন্ত ও হালকা বোধ করিনি। সারা পথ আমি গান গাইতে গাইতে এলাম। স্বদেশী গান যত জানতাম সব গেয়ে ফেললাম। গাড়িতে খাবার ছিল। পথে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলাম। স্টেশন বা লোকজনের সান্নিধ্য যতটা পারি এড়িয়ে চললাম। একেবারে চুঁচুড়ার কাছাকাছি এসে দূর থেকে একটা পুলিশের সমাবেশ চোখে পড়ল। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল—আমার জন্য অপেক্ষা করছে না তো?

বিকেল চারটা নাগাদ আমি ১নং উডবার্ন পার্কে গাড়ি নিয়ে এসে ঢুকলাম। বড় গাড়ির ড্রাইভার এগিয়ে এসে গাড়ির ভার নিল। আমি গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলার হলঘরে মা'র সঙ্গে দেখা। মা বললেন, বাবা এখনই নীচে নামবেন। আমি সিঁড়ির পাশে আমাদের ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই বাবা সে-ঘরে

আমি খুব সংক্ষেপে বাবাকে আমাদের যাত্রা বর্ণনা করে গেলাম। বাবা কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। সবগুলির জবাবই তাঁর সন্তোষজনকে বলে মনে হল। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন বাবা বললেন যে, বারারি থেকে আমার যে টেলিগ্রাম করার কথা ছিল সেটা উনি আর আশা করছিলেন না। কারণ, আমরা চলে যাবার পর ওঁর মনে হয়েছিল যে, এই টেলিগ্রাম করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, রাঙাকাকাবাবুও সে কথা ঠিক বুঝবেন।

সেদিন আমাদের সমস্ত পরিবারের বিয়ের নেমন্তন্ন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাতনী মিনুর সেদিন বিয়ে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলাম। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশ' মাইল গাড়ি ড্রাইভ করেছি। কিন্তু বাবা বললেন যে, আমাকে বিয়ে বাড়ি যেতেই হবে। সব কিছু স্বাভাবিক দেখাতে হবে। বিয়েবাড়িতে অনুপস্থিত থাকা চলবে না। আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে বললেন। বাড়ির সকলে আগে চলে গেলেন। আমি বাবার সঙ্গে একটু দেরি করে পরে গেলাম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। বিয়ে বাড়িতে আবার আমাকেই বিশেষ করে ধরে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন—কি, সুভাষবাবুর কি খবর? আমিও সরলভাবে বললাম—শরীরটা তো তেমন ভাল নেই।

মা'র কাছে শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, বাড়িতে আমার অনুপস্থিতি বিশেষ তেমন নজরে পড়েনি। অন্তর্ধানের পরের দিন সন্ধ্যায় আমার বোন গীতা কলেজ থেকে আমি তখনও ফিরছি না কেন জিজ্ঞাসা করেছিল। মা তাকে বলেছিলেন যে, রাঙাকাকাবাবুর কোন কাজে আমি বাইরে গিয়েছি। ছোটবেলা থেকে আমাদের সকলেরই বেশী কিছু প্রশ্ন না করার ট্রেনিং ছিল। আমার এক জ্যাঠতুতো ও আর এক মাসতুতো দাদা, যাঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি আসতেন, কি জানি কেন ঠিক সেই দু'দিনই তাঁরা আসেননি।

এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় আমি ইলা ও অন্য দুই ভাইকে খবর দিয়ে এলাম যে, সব ঠিক আছে। কেবল ভাঁওতাটা চালিয়ে যেতে হবে এবং we must keep our mouth shut। এর পর আমি প্রতি দিন সন্ধ্যায় আমার পুরোনো অভ্যাসমত এলগিন রোডের বাড়িতে যেতাম। ইলা কায়দা করে আমাকে রাঙাকাকাবাবুর ঘরে ঢুকিয়ে দিত এবং রাঙাকাকাবাবুর জন্য রাখা উপাদেয় খাবারগুলি—ফল, মিষ্টি, ছানা ইত্যাদি আমি আত্মসাৎ করতাম। রাঙাকাকাবাবু ঘরের মধ্যে নির্জনবাস করছেন, এই ভাঁওতাটা পুরো দশ দিন চালিয়ে যাওয়া হল।

২০ জানুয়ারী সোমবার রাঙাকাকাবাবুর একটা মামলা আলিপুর কোর্টে উঠবার কথা। এই শুনানির জন্য মুলতুবি প্রার্থনা করা দরকার। পুরোনো মেডিকেল সার্টিফিকেটের ওপর জজ যদি মুলতুবি মঞ্জুর না করেন, তবে তো মুশকিল। দ্বিজেন আর আমি মেডিকেল কলেজে ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জীর খোঁজে গেলাম। সেখানে তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাড়িতে ধাওয়া করলাম। সেখানেও তিনি নেই। ইতিমধ্যে কোর্ট বসার সময় হয়ে যাচ্ছে। দ্বিজেন আর আমি তখন রাঙাকাকাবাবুর কৌঁসুলীর বাড়ি এলাম, আমি গাড়িতেই বসে রইলাম। দ্বিজেন গিয়ে কৌঁসুলীকে বলল—রাঙাকাকাবাবুর সায়েটিকার ব্যথা খুব বেড়েছে। সকালের মধ্যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট হয়ত হবে না। কৌঁসুলী যেন রাঙাকাকাবাবুর নাম করে এই শেষবারের মত মুলতুবি চেয়ে নেন। যাই হোক, জজ সাহেব শুনানি মুলতুবি রেখেছিলেন।

সেইদিনই কলেজে ফিরে আবার অ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্টে মৃতদেহ ডিসেক্‌শনের কাজে লাগলাম। আমার পার্টনার ছিল নিতান্তই ভালমানুষ, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা হল না। আমাদের demonstrator মহাশয় যখন পার্সেণ্টেজ দিতে এবং পরীক্ষা নিয়ে আমার কার্ড সই করতে এলেন, তখন স্বীকার করতেই হল যে, পারিবারিক কারণে আমাকে দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। তিনি খুবই খোলা মনে বললেন, কলকাতার

বাইরে যে গিয়েছিলে তার পুলিশ রেকর্ড তো আর নেই! তিনি সেই দু'দিনেরও পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলেন ও কার্ড সই করে দিলেন। তাঁর এই ঠাট্টা করে বলা মন্তব্যে আমি এমন চমকে উঠলাম যে, আজ পর্যন্ত আমার সেই ঘটনাটা মনে আছে।

আবার শুনানির তারিখ ধার্য হল ২৭ জানুয়ারী। বাবা বললেন, রাঙাকাকাবাবু সেদিন যখন কোর্টে হাজিরা দিতে উপস্থিত হবেন না, তখন পুলিশ এসে দেখবে উনি নেই, সেটা ভাল হবে না। তার চাইতে পুলিশ জানবার আগেই আমাদের তরফ থেকেই রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের খবর প্রকাশ হওয়া উচিত। রাঙা-কাকাবাবু যে নেই সে কথা যেন আমরা হঠাৎ জানতে পারলাম, সমস্ত ঘটনাটা এভাবে কি করে সাজানো যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ২৫ জানুয়ারী দুপুরে উডবার্ন পার্কে বাবার শোবার ঘরে একটা ছোটখাট বৈঠক হল। সেখানে আমি, দ্বিজেন ও অরবিন্দ ছিলাম। বাবা বললেন, বাবা যেমন সাধারণত শনি-রবিবার ছুটি কাটাতে রিষড়ার বাগানবাড়িতে যেতেন, তেমনি সেদিন সন্ধ্যায় রিষড়া চলে যাবেন। শনিবার সন্ধ্যায় রাঙাকাকাবাবুর জন্য যে খাবার রাখা হবে সেটা কেউ খাবে না। তা হলেই পর দিন সকালে ঠাকুর যখন দেখবে যে, কেউ খাবার স্পর্শ করেনি তখন সে আপনা থেকেই একটা হইচই সৃষ্টি করবে এবং বাড়িসুদ্ধ জানাজানি হবে। তা হলে সমস্ত ব্যাপারটাই খুব স্বাভাবিক হবে এবং তখন আমার ভাইয়েরা চারদিকে রাঙাকাকাবাবুর খোঁজে লোক পাঠাবেন। বাবাকে রিষড়ায় খবর দিতেও একদল ছুটবে। আমি বাবার সঙ্গে রিষড়াতে থাকব।

আমি সেদিন সন্ধ্যায় বাবা, মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে রিষড়ার বাগানবাড়িতে চলে গেলাম। পরদিন ছিল রবিবার, ২৬ জানুয়ারী—আমাদের স্বাধীনতা দিবস। সারা সকাল আমরা—বাবা, মা ও আমি—খুবই উৎকণ্ঠায় কাটালাম। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বেশ অস্থির হয়ে পড়লেন—সব কিছু প্ল্যানমত ঠিক হল কিনা, তখনও কেন কেউ খবর নিয়ে আসছে না, ইত্যাদি। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা বসে যখন জল্পনা-কল্পনা করছি তখন কলকাতার একটা গাড়ি এসে ঢুকল। আমার তুই জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই ব্যস্তসমস্তভাবে বাড়ির ভিতরে এলেন।

গাড়ির আওয়াজ পাওয়ামাত্র আমি অন্য ঘরে গিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। একজন সোজা বাবার ঘরে গিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। জ্যাঠতুতো দাদাটি রসিক লোক ছিলেন, ঠাট্টা-তামাশা ভালবাসতেন। তিনি আমার ঘরে এসে আমাকে ঠেলা দিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বারবার বলতে লাগলেন—'জানো, রাঙাকাকাবাবুকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।' আমার ঘুম তো ভাঙেই না, অন্য দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম—'আঃ, কি সব বাজে কথা বলছ!' তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—'না, না—এটা ঠাট্টা নয়, সত্যিই রাঙাকাকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি, এমন কি বাড়ির চিলের ছাত পর্যন্ত। মেজকাকাবাবুকে খবর দিতে এসেছি।'

আমি শেষ পর্যন্ত উঠলাম এবং ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরোলাম, বাবাও বেরিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে সকলের সামনে বললেন—'সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না।' তিনি আরও বললেন যে, তিনি

যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় যেতে চান। কলকাতা গিয়েই খোঁজখবর করবার প্ল্যান ঠিক করবেন। দুইজন বার্তাবাহককে আগেই ফিরে যেতে বলে নিজে প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

সেই ওয়ানডারার গাড়িতে আবার বাবাকে পাশে বসিয়ে আমি কলকাতার পথে রওনা হলাম। বুঝতে পারলাম গাড়িতে বাবা তাঁর প্ল্যান মনে মনে ঠিক করছিলেন। কথাবার্তা বেশী বললেন না। বাবাকে নিয়ে আমি সোজা এলগিন রোডের বাড়িতে এলাম। বাবা রাঙাকাকাবাবুর অফিস-ঘরে বসলেন। সেখানে সকলেই কি হয়েছে সে সম্বন্ধে নিজস্ব 'রিপোর্ট' ও মতামত দিতে লাগল। বাবা নাম করে করে কয়েকজন পারিবারিক বন্ধুকে খবর দিতে বললেন। একে একে অনেকেই এসে পড়লেন। যেমন সত্যরঞ্জন বক্সী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। আত্মীয়দের ভিড় তো হলই। শলাপরামর্শ চলতে লাগল। মাজননী তাঁর নিজের ঘরে মোটামুটি শান্তভাবেই বসে ছিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলেন। মাজননীকে কিছু বলার ছিল না—এটাই হল বাবার কাছে এক কঠিন পরীক্ষা। কিছুক্ষণ পরে বাবা দলবল নিয়ে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এলেন ও নিজের অফিস ঘরে বসলেন। বন্ধুরা বাবার উপর নানারকম পরামর্শ, উপদেশ ও মতামত বর্ষণ করতে লাগলেন ও বাবা পরম ধৈর্যভরে সব কিছু শুনে গেলেন। তারপর কয়েকটি টেলিগ্রাম পাঠালেন ও কলকাতার কয়েকটি জায়গায় খোঁজখবর করার জন্য বিশেষ করে আশ্রম, মঠ, মন্দির ইত্যাদি বেছে নিলেন।

এলগিন রোডে ও উডবার্ন পার্কে আমি যতটা সম্ভব অন্তরাল থেকে এবং বোকা সেজে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলাম—খানিকটা উপভোগও করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমারও ডাক পড়ল। অফিস-ঘরে সকলের সামনে বাবা আমাকে বললেন, এঁরা বলছিলেন কেওড়াতলার শ্মশান ও কালীঘাটের মন্দিরের দিকটা একটু দেখে আসা উচিত। তুমি অমুককে সঙ্গে নিয়ে ওয়ানডারার গাড়িটা করে একটু দেখে এসো। আমি খুব বাধ্য ছেলের মত একটি দল

নিয়ে ওয়ানডারার গাড়িতে চড়ে রাঙাকাকাবাবুকে 'খুঁজতে' বার হলাম। কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর সমাধি-মন্দিরটা ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। নেশায় মশগুল কতকগুলি বিচিত্র মানুষ সেখানে জমিয়ে বসে আছে—দেখে বড় দুঃখ হল। তারপর গেলাম কালীঘাটের মন্দিরে। সেখানেও বিফলমনোরথ হলে একজন সঙ্গী কাছেই তাঁর বিশেষ পরিচিত একটি কালীভক্ত বাবার কাছে যাবার প্রস্তাব করলেন। লম্বা সরু গলির শেষ প্রান্তে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। পাশেই কালীমূর্তি। খবর শুনে তিনি চ্যালেঞ্জিং সুরে আমার সঙ্গীকে বললেন—'আমি আগেই বলিনি কি যে, সুভাষবাবুকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারবে না। দেখলে তো তাই হল!' অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি বললেন যে, চন্দননগরের কাছে অমুক মন্দিরে খোঁজ করে দেখতে পার। তবে সারা রাত মায়ের পূজার পর সকালের দিকে তিনি আরও সঠিক করে বলতে পারবেন। বাড়ি ফিরে আমাদের নিষ্ফল যাত্রার কথা বাবা ও অন্যান্যদের জানালাম।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড়ও কমল, বাবা তখন সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন, সংবাদটি খবরের কাগজে পরদিন সকালে ছাপা হবে কিনা, যদি হয় তো কি বলা হবে সেটা বিবেচনা করতে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটি খসড়া তৈরি করলেন এবং সুরেশবাবু সেটি নিয়ে বিদায় হলেন।

পরদিন ২৭ জানুয়ারি, কঠিন পরীক্ষার দিন। প্রথমত, রাঙাকাকাবাবুর মামলা উঠবে; সকালেই খবরটি প্রচার হয়ে যাওয়ায় কোর্টের ব্যাপারটা সহজ হল। দ্বিতীয়ত, পুলিশের প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে এবং তারা কি করবে? বোঝাই গেল বাংলাদেশের পুলিশ একেবারেই হকচকিয়ে এবং বোকা বনে গিয়েছে। এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছতেই তাদের অনেক দেরি হল। তাদের কাছে বারবার করে রাঙাকাকাবাবুর গৃহত্যাগের অলীক কাহিনীটি শোনানো হল। যথা, তিনি দশদিন যাবৎ নির্জনবাসে ছিলেন। রাতের খাবার অভুক্ত পড়ে থাকায় সন্দেহ হয় এবং

পর্দা সরিয়ে দেখা যায়, তিনি নেই। বিকালে গাড়ি-বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে আমি পুলিশের একটি দলের পরীক্ষা দেখছিলাম।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ

গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েক-দিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমন কি আত্মীয়স্বজনের সহিতও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।

(২৭।১।৪১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিলিপি।)

দেখলাম তারা পলায়নের পথ খুঁজছে বিশেষ করে বাড়ির পিছনে; এবং এক পাশের জমাদারের ছোট দরজার দিকে। তাদের আচরণ ও পরীক্ষার ধরন দেখে আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

সেদিন কিংবা পরের দিন সন্ধ্যায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও হঠাৎ ঘোষণা করে বসল যে, সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি গতকাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, ঝরিয়ার কাছে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাবা খবরটি শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরকম হওয়া সম্ভব কিনা। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'পুরো দশ দিন কেটে গেছে, এখন উনি ঐ অঞ্চলে থাকবেন কি করে!' বাবা বললেন, 'ধর যদি তার সব প্ল্যান ভেস্তে গিয়ে থাকে এবং যদি সে বাড়ি ফিরবার পথে ধরা পড়ে

থাকে ?' আমি কিন্তু ঐরকম সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দিলাম। যাই হোক, বন্ধুদের পরামর্শে বারারিতে দাদাকে (ডঃ অশোকনাথ বসু) টেলিফোন করা হল এবং ধানবাদ গিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ করতে বলা হল। কিছুক্ষণ পরেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া থেকে খবরটি ভিত্তিহীন বলে প্রচার করা হল। বাবা আমাকে বললেন মাজননীকে খবরটি দিয়ে আসতে।

পুলিশ ছাড়াও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব দলে দলে আসতে লাগলেন। ওঁদের সকলকে বারেবারে কাহিনীটি শোনানো হল এবং রাঙাকাকাবাবুর ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজানো ব্যবস্থাটি দেখানো হল! রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত ভৃত্যটি কিন্তু একটি বিপজ্জনক আবিষ্কার করে ফেলল। সে ইলাকে বলল যে, তিনি তো সবই ফেলে গেছেন কিন্তু তাঁর ফিতে-বাঁধা মজবুত জুতো জোড়াটি তো নেই! ইলা অপ্রস্তুত হয়ে তাকে বলে ফেলল যে, জুতো জোড়াটি

WHAT HAS HAPPENED TO SJ. SUBHAS CH. BOSE?

Unexpected Exit From Home

Great anxiety prevails amongst the relatives and friends of Sj. Subhas Bose since yesterday afternoon when it was noticed that he was not in his room where he was confined since his release from jail in the 1st week of December last. It is generally known that from the last few days he was observing strict silence and had not been seeing anybody not even the members of his family but has been spending his time in religious practices. Anxiety is all the more acute on account of his present state of health.

Enquiries have been made at various places about him but up to the time of going to the Press we understand he has not returned home.

(২৭।১।৪১ তারিখে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত খবরের প্রতিলিপি।)

রাঙাকাকাবাবু মেরামতের জন্য দিয়েছেন।

এর পরের দু'মাস প্রতি দিন আমাদের গভীর উৎকণ্ঠা ও চাপা উত্তেজনায় কাটল। প্রায়ই রাত্রে বাবা খাওয়াদাওয়ার পর আমাকে ডাকতেন, মশারির মধ্যে বাবার বিছানায় বসে গুজগুজ করে কথাবার্তা হত। বাবা কোন সূত্র থেকে কি শুনছেন সব বলতেন—পুলিশের লোকেরা এই বলছে, অফিসারের মত এই, বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রচার করছে—এমন কি, জ্যোতিষীরা কি বলছে—তাও। আমিও বিভিন্ন সূত্র থেকে যা সব শুনতাম বাবাকে জানাতাম। কথাবার্তা শেষ হলে আমাকে বাবার নির্দেশে আলো না জেলে অন্ধকারের মধ্যে উপরতলায় শুতে যেতে হত, যাতে বাড়ির বাইরেকার সি আই ডি-র চরেরা জানতে না পারে যে, আমরা পিতা-পুত্র গভীর রাত পর্যন্ত কোন শলাপরামর্শ করছি।

এর পরে কিছুকাল ধরে এলগিন রোডের বাড়ীতে গিয়ে কতরকমের কথা যে শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন—বিশেষ করে যাঁদের মনে নানা রকমের সন্দেহ ছিল। মাজননীর দুশ্চিন্তা লাঘব করার উপায় না থাকায় বাবা বিশেষ দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। অনেকদিন পরে ঠাকুমা (বাসন্তী দেবী) আমাদের বলেছিলেন—সুভাষ চলে যাবার পর তোমাদের মাজননীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখি, শরৎ এক পাশে চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে এবং তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, পরে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা জেনেও মাকে বলতে না পারায় শরতের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কেউ কেউ বোধহয় যথার্থই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে রাঙাকাকাবাবু সন্ন্যাস নিয়েছেন। যেমন, আমার ধর্মপ্রাণ দিদিমা আমাদের ধর্মবিমুখতার নিন্দা করে একদিন বললেন—এইবার তোমাদের উচিত শিক্ষা হবে, দেখবে তোমাদের রাঙাকাকাবাবু নামাবলি গায়ে, মাথায় শিখা ধারণ করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ফিরবেন। সম্পূর্ণ বিপরীত ও অভিনব

মত শুনলাম এলগিন রোডের বাড়িতেই এক অতি নিকট-আত্মীয়ের মুখে। তিনি বললেন, সুভাষ রাজনৈতিক জীবনে সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে হতাশায় নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছে—তার মৃতদেহের খোঁজ করাই উচিত হবে। কারণ, সুভাষের পক্ষে ভারতবর্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, তাকে দেশের বাচ্চাকাচ্চারাও চেনে, রাস্তার ধারে মুড়ি কিনে খেতে গেলেও তো ধরা পড়ে যাবে!

কিভাবে রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়ি থেকে চলে গেলেন তার উপর নানারকমের থিওরি শুনতে লাগলাম। যেমন, কেউ কেউ একটি গল্প প্রচার করলেন যে একদিন সন্ধ্যায় তুইজন পাগড়িধারী শিখ ভদ্রলোক রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তিনজন শিখ ভদ্রলোক। কেউ বললেন, তিনি নাকি ১৯শে জানুয়ারী এক জাপানী জাহাজে করে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে খিদিরপুর ডক্ থেকে পাড়ি দিয়েছেন। ইদানীং দিল্লীর ন্যাশনাল আরকাইভ্স্-এ পুলিশের পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখেছি যে দিল্লীর কর্তারাও প্রথম দিকে তাঁর খোঁজ করছিলেন সিঙ্গাপুর ও হংকং এলাকায়। আর একটা অভিনব গল্পও শোনা গেল—তিনি নাকি এক গভীর রাতে হুগলীর এক মাঝিকে অনেক বক্শিশ দিয়ে তাঁকে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যেতে বলেন—সেখানে এক ডুবো জাহাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী কেউ কেউ বললেন যে, রাঙাকাকাবাবু যোগবলে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন।

এই ধরনের বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা নির্লিপ্তভাবে আমাকে শুনে যেতে হত। কিন্তু কখনও কখনও আমি মনে মনে বেশ বিরক্ত হতাম এবং প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা জোর করে দমন করতে হত।

অবশ্য রাঙাকাকাবাবুর কোন কোন রাজনৈতিক সহকর্মী জনসভায় অথবা ঘরোয়াভাবে বলতেন যে সুভাষচন্দ্রের জীবনের একমাত্র তপস্যা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং তিনি হলেন কর্মযোগী। তিনি যেখানেই গিয়ে থাকুন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই

দেশের মুক্তির সন্ধানে গিয়েছেন। এ ধরনের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত।

বলাই বাহুল্য, খবরের কাগজে কি বেরোচ্ছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি সব সময়েই ছিল। আমরা চাইছিলাম যে এটা ভালভাবে প্রচার হোক যে, রাঙাকাকাবাবু সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে চিন্তা ছিল কম, কারণ বাবা ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু সবক্ষেত্রে তো সংবাদপত্রের নীতি কি হবে তা বাইরে থেকে ঠিক করে দেওয়া যায় না। যেমন কলকাতার আর একটি বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ইংরাজী দৈনিকে এমন এক সম্পাদকীয় লেখা হল যে, আমি তো রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। লেখকের বিশ্লেষণ অবশ্য তারিফ করবার মত হয়েছিল, কিন্তু আমার ভয় হল, আমাদের সাজানো গল্প বুঝি ধোপে টিকছে না। আমি বাবাকে সম্পাদকীয়টি থেকে পড়ে শোনালাম :

"To say that he felt sick of the whole thing and wanted to leave his work where it was, is to do scant justice to the past of the man...........If the causes of his disappearance are full of mystery, no less are the circumstances surrounding it...........How is it that a patient supposed to be in such an extremely weak state of health, left his room, apparently unobserved by the inmates of his house? Is he in India and, if so where? When did he leave his place and when had he been last seen?.........it will remain a mystery that he was able to leave his room at all presumably without assistance and possibly at mid-winter night? On Saturday night it was raining heavily......His relatives believe that he must have left on Saturday, past midnight, when everybody was supposed to be asleep. The gates of the house were open no doubt but were guarded by two watch-dogs. How was it possible for Srijut Bose to leave the house under these circumstances?

"উনি সবকিছুর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের কাজকর্ম যেমন ছিল, ফেলে রেখে চলে যেতে চেয়েছিলেন—এ কথা বললে এই মানুষটির অতীতের প্রতি বিন্দুমাত্রও সুবিচার করা হবে না।…তাঁর অন্তর্ধানের কারণগুলি যদি রহস্যাবৃত হয় তবে অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত পরিবেশ আরো বেশী রহস্যাবৃত। এটা কি করে সম্ভব যে ওঁর মত একজন রোগী, যার স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে বলা হচ্ছে—ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আর বাড়ির লোকজনেরা তা দেখতেই পেল না? উনি কি ভারতবর্ষে আছেন? যদি থাকেন তো কোথায়? উনি কখন গৃহত্যাগ করলেন এবং কখন তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল?…এটা একটা রহস্য থেকে যাবে যে উনি, যেমন বলা হচ্ছে, কারো সাহায্য ছাড়া শীতকালের মাঝ রাত্তিরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারলেন? শনিবার রাত্রে প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল—ওঁর আত্মীয়স্বজনদের বিশ্বাস যে উনি নিশ্চয় শনিবারে মধ্যরাত্রের পর যখন সকলে, ধরে নেওয়া হচ্ছে, নিদ্রিত ছিল—তখন চলে গিয়েছেন। একথা ঠিক যে বাড়ির গেট খোলাই ছিল কিন্তু দু'টি পাহারাদার কুকুর তো বাড়ি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে কি ভাবে শ্রীযুত বোসের পক্ষে গৃহত্যাগ করা সম্ভব?"

দেশের নেতৃস্থানীয়দের অনুসন্ধানের উত্তরে বাবা অনেক ভেবে-চিন্তে বিভিন্ন ধরনের জবাব দিলেন। গান্ধীজি লিখলেন—"wire truth", বাবা জবাব দিলেন—"Circumstances indicate renunciation।" রবীন্দ্রনাথের বেলায় বাবা একটু ব্যতিক্রম করলেন। লিখলেন—"Hope he will have your blessings wherever he may be"। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লেখা হল, "No news"।

মাস তিনেক পরে আমার বাবা ও মা কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। ততদিনে রাঙাকাকাবাবুর জার্মানীতে পৌঁছবার খবর এসে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বাবাকে বলেছিলেন, "তুমি আমাকে বলতে পার" এবং বাবা তাঁকে রাঙাকাকাবাবুর

আসল খবর দিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে বাবা আমাকে জানান যে, রবীন্দ্রনাথ রাঙাকাকাবাবুর জন্য এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তিনি তাঁকে সত্য কথা না বলে পারেননি।

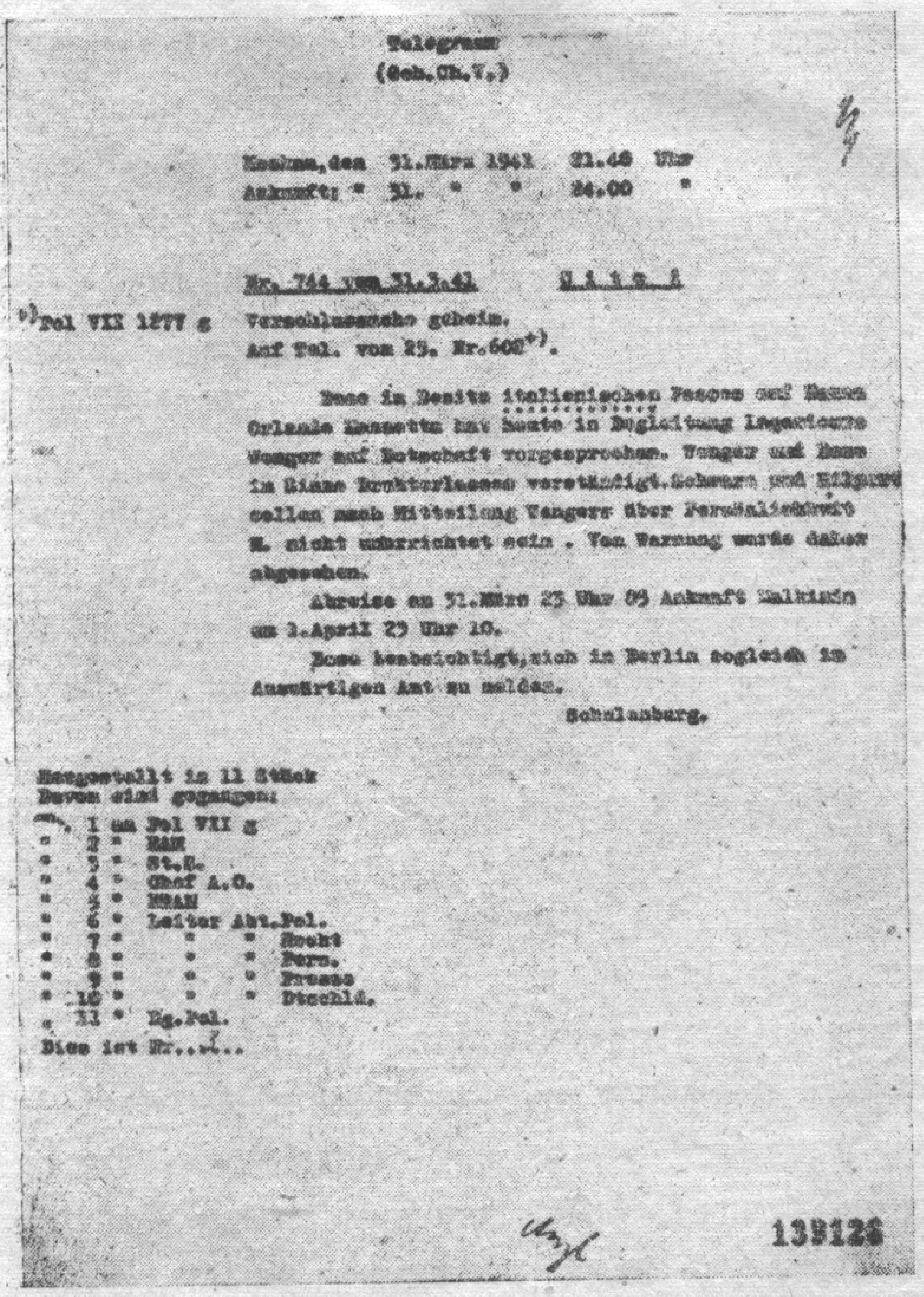
শেষ পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শেষ হল ৩১ মার্চ-এ। সন্ধ্যাবেলা উডবার্ন পার্কের দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় মা ও বোনের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছি, বেয়ারা এসে একটি স্লিপ আমার হাতে দিল। স্লিপটা হাতে নিয়ে কিছু না ভেবেই অন্যমনস্কভাবে আমি জোরে জোরে পড়ে ফেললাম— Bhagat Ram, I come from frontier. পড়ে ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। মা'র সঙ্গে আমার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হল।

এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, জোরে জোরে বললাম—'আবার জ্বালাতে এসেছে! এ সেই কাশ্মীরের কার্পেটওয়ালাটা। বলছি দরকার নেই, তবুও ছাড়ছে না।'

নেমে এসে দেখলাম, সামনের বারান্দায় দু'জনে দাঁড়িয়ে আছেন, একজন নেহাতই যুবা, সুদর্শন ও গৌরবর্ণ। আর একজন খানিকটা বয়স্ক, মোটাসোটা ও পুরোপুরি বিলাতী ধরনের পোষাক পরা। যুবকটি বললেন, তিনিই স্লিপটি আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং গলা নামিয়ে আরও বললেন যে, তাঁরা সুভাষবাবুর খবর নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমার ডাকনাম জানেন কিনা এবং আমি কি করি। দুটোরই সন্তোষজনক জবাব পাবার পর আমি তাদের পশ্চিম দিকে রাঙাকাকাবাবুর আগেকার অফিস-ঘরে নিয়ে গেলাম। ভগৎরাম বললেন যে, তিনিই পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর সাথী ছিলেন এবং কাবুল থেকে মস্কোর পথে তাঁকে রওনা করিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। সেই দিনই রাঙাকাকাবাবুর মস্কো পৌঁছবার কথা।

ভগৎরাম ঠিকই বলেছিলেন। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় সেই সময়কার জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের যেসব নথিপত্র এসেছে, তার মধ্যে মস্কো থেকে জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবুর্গের ৩১শে মার্চের একটি টেলিগ্রাম আছে। শুলেনবুর্গ

টেলিগ্রাম মারফত বার্লিনে জানাচ্ছেন যে সুভাষচন্দ্র বসু অরল্যাণ্ডো মাৎসোতা ছদ্মনামে সেইদিনই মস্কোতে পৌঁচেছেন এবং ১লা এপ্রিল শেষরাত্রে বার্লিন পৌঁছবেন।



Telegramm
(Geh.Ch.V.)

Moskau, den 31. März 1941 21.46 Uhr
Ankunft: " 31. " " , 24.00 "

Nr. 744 vom 31.3.41

+) Pol VII 1277 g

Verschlusssache geheim.
Auf Tel. vom 29. Nr. 602+).

Bose im Besitz italienischen Passes auf Namen Orlando Mazzotta hat heute in Begleitung Legationsrat Wenger auf Botschaft vorgesprochen. Wenger und Bose im Sinne Drahterlasses verständigt. Schwarz und Hilgard sollen nach Mitteilung Wengers über Persönlichkeit B. nicht unterrichtet sein. Von Warnung wurde daher abgesehen.

Abreise am 31. März 23 Uhr 05 Ankunft Bahnhof am 1. April 23 Uhr 10.

Bose beabsichtigt, sich in Berlin sogleich im Auswärtigen Amt zu melden.

Schulenburg.

Hergestellt in 11 Stück
Davon sind gegangen:
Nr. 1 an Pol VII g
" 2 " RAM
" 3 " St.S.
" 4 " Chef A.O.
" 5 " MRAM
" 6 " Leiter Abt. Pol.
" 7 " " " Recht
" 8 " " " Pers.
" 9 " " " Presse
" 10 " " " Dtschld.
" 11 " Ug. Pol.
Dies ist Nr. ...

139126

সুভাষচন্দ্রের মস্কো পৌঁছবার খবর দিয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবুর্গ ৩১।৩।৪১ তারিখে বার্লিনে যে তারবার্তা পাঠান, এটা তারই প্রতিলিপি।

মূল জার্মান বার্তাটির বঙ্গানুবাদ নীচে দিলাম ঃ

"বোস আজ অরল্যাণ্ডো মাৎসোতা নামে ইতালীয় পাসপোর্ট নিয়ে এঞ্জিনিয়ার ওয়েঙ্গারের সঙ্গে দূতাবাসে এসেছিলেন। টেলিগ্রামের নির্দেশমত বোস ও ওয়েঙ্গারকে জানিয়েছি। ওয়েঙ্গার বলল যে, শোয়াৎর্স ও হিলপার্ট মাৎসোতার আসল পরিচয় জানে না। এখান থেকে কোন সাবধানবাণী দেবার প্রয়োজন নেই।

যাত্রার সময় ৩১শে মার্চ, ২৩-০৫ মিনিট; মালকিনিয়ায় পৌঁছানর সময় ১লা এপ্রিল, ২°-১০ মিনিট। বোস এখনই পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান।

শুলেনবুর্গ"

ভগৎরাম বাবার কাছে বাংলায় লেখা রাঙাকাকাবাবুর একটি চিঠি ও দুটি লেখা নিয়ে এসেছেন। সেগুলি তিনি বাবাকে দিতে চান। বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। স্লিপটিতে তিনি তাঁর আসল নাম লিখেছেন বলে সেটি নষ্ট করে দিতে বললেন।

আমি ভগৎরাম ও তাঁর সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলে বাবার খোঁজে গেলাম। একটু পরেই বাবা স্নান সেরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। তিনি তাঁর অফিস-ঘরে যাবার আগেই আমি তাঁকে ধরলাম এবং পশ্চিমের ঘরে নিয়ে এলাম। ভগৎরাম আবার বাবাকে রাঙাকাকাবাবুর খবর দিলেন এবং তিনটি লেখা বের করলেন। বাবা আমাকে লেখাগুলির দায়িত্ব নিতে বলে ভগৎরামকে আমাদের বাড়িতে আর না আসতে পরামর্শ দিলেন। ঠিক হল যে পরদিন ভোরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে তাঁরা বাবার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সেখানেই তাঁদের সব কথাবার্তা হবে।

ভগৎরামকে বিদায় দিয়ে বাবা আমাকে লেখাগুলি তিনতলায় নিজের ঘরে নিয়ে যেতে বললেন এবং সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে পরে রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

লেখাগুলির মধ্যে প্রথমটি ছিল বাবার উদ্দেশে পেনসিলে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠি। চিঠিতে কোন স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু হাতের লেখা ও ভাষার দিক থেকে কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয়টি ছিল কালি-কলমে ইংরেজীতে দেশবাসীর উদ্দেশে লেখা—Message to My Countrymen, from somewhere in Europe. এটিতে রাঙাকাকাবাবুর পুরো সই ছিল এবং তারিখ দেওয়া ছিল ১৭ মার্চ, ১৯৪১। কিছু দিন পরে এটি ছাপিয়ে নানা জায়গায় বিতরণ করা হয়েছিল। তৃতীয়টি ছিল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ : Forward Bloc—its justification.

পেনসিলে লেখা এই প্রবন্ধটি পরে প্রকাশিত হয়েছে এবং মূলটি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় আছে।

বাবাকে লেখা বাংলা চিঠিতে রাঙাকাকাবাবু লিখেছিলেন যে, তিনি আবার যাত্রা শুরু করছেন, তবে "পথে অনেক দেরী হয়ে গেল এই যা দুঃখ।" পথে নানা রকমের অসুবিধারও ইঙ্গিত চিঠিতে ছিল এবং পত্রবাহক (ভগৎরাম) যে তাঁর অনেক সেবা করেছেন তারও উল্লেখ ছিল। শেষে বাড়ির সকলে কুশলে আছেন এই আশা প্রকাশ করে বাবাকে ও 'মেজবৌদিদি'কে প্রণাম জানিয়েছিলেন। চিঠির নীচে তার "কন্যা"র জন্য অর্থাৎ ইলার জন্য দু'লাইন লিখেছিলেন এবং সেটা তাকে দেখাতে বলেছিলেন। কিছুদিন পরে ইলা কলকাতায় এলে আমি চিঠির সেই অংশটি তাকে দেখিয়েছিলাম।

"Message to My Countrymen"-এ রাঙাকাকাবাবু তাঁর বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ ও সহজভাবে কিছু বলেছিলেন। গোপন যাত্রার সময় সাহায্য করার জন্য বর্মা ও চীনের বন্ধুদের ধন্যবাদ দিয়েছিলেন! গেলেন আফগানিস্তান ও রাশিয়া হয়ে, ধন্যবাদ দিলেন বর্মা ও চীনের বন্ধুদের! বলাই বাহুল্য, শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তিনি এটা করেছিলেন। Messageটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে খবরের কাগজে পড়লাম যে, বিহার গভর্নমেণ্ট আপত্তিকর ইস্তাহার হিসাবে সেটি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

অনেক রাত পর্যন্ত সবগুলিই বেশ কয়েকবার পড়লাম, বহু দিনের সঞ্চিত উদ্বেগ কেটে গেল এবং এক বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠল।

॥ ১৯ ॥

ভগৎরাম রাঙাকাকাবাবুর নিরাপদে দেশত্যাগের যে সংবাদ বহন করে আনলেন, সেখানেই এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি হতে পারত, কিন্তু এর পরবর্তী দু-একটি ঘটনার বিবরণ না দিলে এই মহানিষ্ক্রমণের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এর পরের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কলকাতার জাপানী কনস্যুলেটের মাধ্যমে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। ভগৎরাম আসবার মাস দুয়েক বাদে বাবা আমাকে এক সন্ধ্যায় নীচে ডেকে পাঠালেন, গিয়ে দেখি কালো টুপি মাথায় এক বাঙালী ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাবা আমাদের পরস্পরকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন যে, কলকাতার জাপানী কনসাল জেনারেল তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চান। রিষড়ার বাগানবাড়িতে দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ বাঙালী ভদ্রলোক কনসাল জেনারেল ওকাজাকিকে নিয়ে সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গার ধারে এক নির্দিষ্ট জায়গায় আসবেন। আমি গাড়ি নিয়ে সেই সময় সেই জায়গা থেকে ওকাজাকিকে তুলে নিয়ে রিষড়ায় যাব। বাবা প্রথমে বলেছিলেন যে ড্রাইভার গাড়ি চালাবে। কিন্তু আমি এই ধরনের বিপজ্জনক কাজে ড্রাইভারকে সাক্ষী রাখা পছন্দ করলাম না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে আমি নিজেই ওয়ানডারার গাড়ি চালিয়ে গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে হাজির হলাম। মস্ত একখানা গাড়ি থেকে নেমে ওকাজাকি আমার পাশের সীটে বসলেন। আমি সোজা রিষড়ার দিকে রওনা দিলাম।

রাঙাকাকাবাবু জার্মানী থেকে জাপানে সংবাদ পাঠিয়েছেন—

সেই সংবাদ কলকাতার জাপানী কনস্যুলেটে এসে পৌঁচেছে, ওরা কোডের অর্থ উদ্ধার করে সংবাদ আমাদের দিতে এসেছেন।

ওকাজাকির হাতে বাবা রাঙাকাকাবাবুর বার্তার একটা উত্তরও দিলেন, আমাকে বললেন, 'তোমার কথাও লিখে দিলাম।' বললেন, 'লিখেছি যে, দি মেডিকেল স্টুডেন্ট ইজ অল রাইট।'

জাপানী কনস্যুলেটের মাধ্যমে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বাবার নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হল। ওকাজাকির পর সংবাদ আনা-নেওয়ার কাজের ভার নিলেন কনসাল ওতা। এই ওতাও ও তাঁর স্ত্রী রিষড়ার বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন। শ্রীমতী ওতা সঙ্গে আসতেন যাতে ব্যাপারটা নিছক সামাজিকতা অর্থাৎ সোশ্যাল কল্ বলে মনে হয়। শ্রীমতী ওতা আবার শাড়ি পরে আসতেন।

সম্প্রতি এই গোপন যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আমেরিকান ঐতিহাসিক শ্রীমতী জয়েস লেব্রা নেতাজী ভবনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল নেতাজী সেমিনারে দিয়েছেন। শ্রীমতী লেব্রা জাপানী সরকারের পুরোনো নথিপত্রের মধ্যে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে পাঠানো ওকাজাকির তারবার্তা দেখেছেন। সেই বার্তায় ওকাজাকি জাপানী গভর্নমেণ্টকে বার্লিনে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছেন। আরও বলছেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানের উচিত সুভাষপন্থী চরমপন্থী সংগ্রামী দলকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা।

বলাই বাহুল্য, নিয়মিত রেডিও শোনা ও রাঙাকাকাবাবুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে কোন রকম ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করা আমার দিন ও রাতের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। বছরের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন টোকিও রেডিও থেকে বলল যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে রয়েছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে জার্মানীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। খবরটা শুনে আমিও বেশ বিচলিত হলাম। মনে হল যেন অসময়ে অতি গোপনীয় খবরটি ফাঁস হয়ে গেল। রাতে বাবাকে জানালাম। ঐ সময়ে জাপান

থেকে ঐ ধরনের খবর প্রচারের তাৎপর্য বুঝলাম না। শ্রীমতী লেব্রার গবেষণা থেকে অবশ্য আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, ঐ সময়েই রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে জাপানের কর্তৃপক্ষ সক্রিয় "অনুসন্ধান" আরম্ভ করেন এবং আরও কিছুদিন পরে বার্লিনে মিলিটারি অ্যাটাচে ইয়ামামোটো ও রাষ্ট্রদূত ওশিমার মারফত—তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন।

পূজার ছুটিতে কারসিয়ং-এ বাবা জাপানী কনস্যুলেটের মারফত রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বার্তা আদানপ্রদানের বিষয়ে নিভৃতে আমাকে কিছু কিছু বললেন। জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করায় পশ্চিম থেকে বড় কিছু করা সম্বন্ধে আমি তখন ব্যক্তিগত-ভাবে খুবই সন্দিহান ও নিরাশ হয়ে পড়েছি। বাবার কাছ থেকে শুনলাম যে জার্মানরা রাঙাকাকাবাবুকে বলছে যে, রাশিয়ার যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে দেরী নেই—ব্যাপারটা "a matter of weeks". অন্যদিকে রাঙাকাকাবাবু জানিয়েছেন যে তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ও তাঁর সাঙ্গো-পাঙ্গোদের ভারতবর্ষ ও এশিয়া সম্বন্ধে educate করা। এসব বিষয়ে অনেক পুরোনো কাগজপত্র অবশ্য এখন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে আমরা পড়ছি।

১৯৪১এর ১১ই ডিসেম্বর বাবা গ্রেপ্তার হলেন। গভর্নমেণ্ট একটি ইস্তাহারে বললেন যে জাপানীদের সঙ্গে বাবার এমন ধরনের যোগাযোগ হয়েছে যে তাঁকে বন্দী করা প্রয়োজন। আসলে কিন্তু জাপানীরা ছিল উপলক্ষ্য, যোগাযোগ হয়েছিল রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াই-এর প্রস্তুতির ব্যাপারে। সাথে সাথে বাবা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পতন হল এবং বাবা নিজে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হলেন। দুইদিক থেকে—ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে—ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অবস্থাটা যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠল সেটা অনস্বীকার্য।

বাবাকে সুদূর দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়ে দেবার পর ভাইস্‌রয় লর্ড লিনলিথগো বিলাতে ভারতের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট লিওপোল্ড এমেরীকে এক গোপন চিঠিতে লিখলেন:

"It is obvious that it was well to have got Sarat Bose away from here........... in fact one individual went so far as to suggest that it was almost the case that Cabinet meetings were held in his quarters in the Jail : .... his contacts with the Japanese were an additional reason for exercising the greatest care in his case."

"এ কথা পরিষ্কার যে শরৎ বোসকে এখান (কলকাতা) থেকে সরিয়ে দিতে পারাটা খুবই ভাল হয়েছে। বাস্তবিক একজন তো এমন কথাও বললেন যে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে জেলে ওঁর ঘরের মধ্যেই মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বলা যায়!...... ওঁর সঙ্গে জাপানীদের যোগাযোগও আর একটি কারণ যার জন্য ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।"

বাবার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘোর দুঃসময় শুরু হল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের শ্যেনদৃষ্টি তো আছেই—জনকয়েক ছাড়া আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ রাখাও বিপজ্জনক মনে করে আমাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগলেন। আমার মা তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। সংসার তো চালানোই দায়, তার উপর আবার সরকারী জুলুম এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের শীতল আচরণ। বাবা বন্দী হবার পর নিজে ধরা পড়া পর্যন্ত সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয় মাঝে মাঝে এসে মাকে রাঙাকাকাবাবুর খবরাখবর জানিয়ে যেতেন। আমি আড়াল থেকে কিছু কিছু শুনে ফেলতাম। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কাবুল মারফত যোগাযোগ রাখবার জন্য সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন করা হয়েছিল—তার বাঙ্গালী প্রতিনিধি মারফত সত্যবাবু রাঙাকাকাবাবুর খবর পেতেন।

অন্যদিকে জাপানীদের ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা এক নতুন

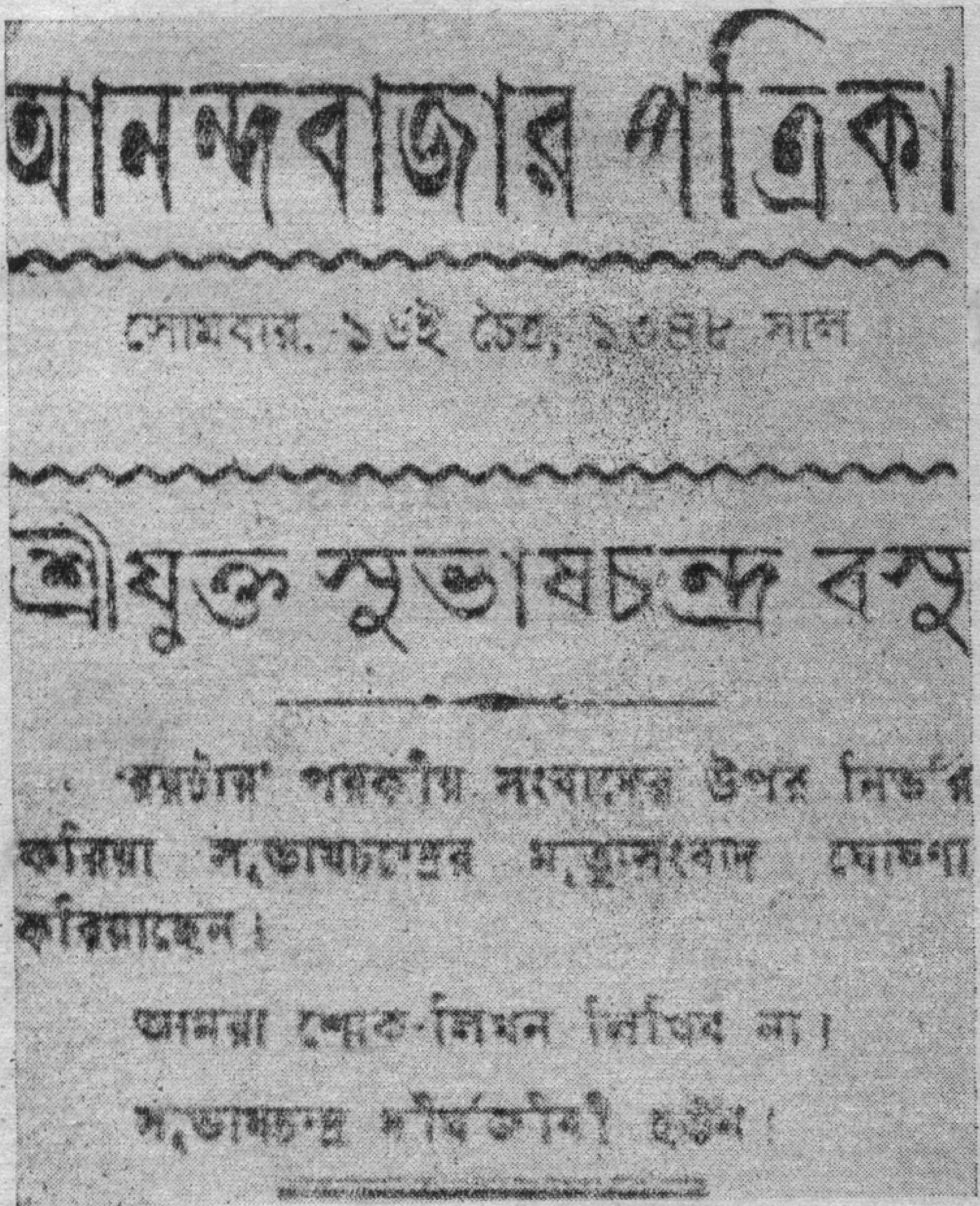
সম্ভাবনা এনে দিল এবং যুদ্ধে জাপানীদের অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের মনে—সাধারণ ভাবে দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে—নতুন আশার সঞ্চার করল।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি কানাঘুষো শোনা গেল যে আজাদ হিন্দ্ রেডিও নামে একটি গোপন রেডিও ষ্টেশন চালু হয়েছে এবং তারা প্রচার করেছে যে, শীঘ্রই সুভাষচন্দ্র বসু ঐ বেতারে বক্তৃতা করবেন। অনেক চেষ্টা করেও প্রথম প্রথম আজাদ হিন্দ্ রেডিও ধরতে পারলাম না। সৌভাগ্যবশতঃ বার্লিন রেডিও রাঙাকাকাবাবুর প্রথম বেতার বক্তৃতা পুনঃপ্রচার করল এবং আমরা শুনলাম। তারপর থেকে রাতের পর রাত রেডিওর কাঁটা ধরে বসে থাকাই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এখনও শুনতে পাই আজাদ হিন্দ্ রেডিওর বাংলা প্রোগ্রামের শুরুতে সেই গর্জ্জন :

> "বল্ রে বন্য হিংস্র বীর,
> দুঃশাসনের চাই রুধির……"

১৯৪২-এর মার্চের শেষ সপ্তাহে নাইট ডিউটি সেরে একদিন ভোরে মেডিকেল কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি। বাসে একজন সহযাত্রীর হাতে Statesman কাগজের প্রথম পাতায় রাঙাকাকাবাবুর ছবি চোখে পড়ল। খুবই আশ্চর্য লাগল, কারণ ঐ কাগজে তাঁর ছবি বেরোন সেকালে খুব স্বাভাবিক ছিল না। যাত্রীটির পাশ ঘেঁষে ফলাও করে ছবি ছাপার কারণটি পড়লাম—২৪শে মার্চ নাকি জাপানের উপকূলে এক বিমান দুর্ঘটনায় রাঙাকাকাবাবুর মৃত্যু হয়েছে। খবরটি যে ভুল এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। বাড়ি ফিরে দেখি মা স্থির হয়ে যেন আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন—চোখে জল। আমি তো বেশ জোর গলায় ও ও স্থির বিশ্বাসে খবরটি উড়িয়ে দিলাম। বললাম, আপনি তো জানেন রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে আছেন এবং এখন সেখান থেকে প্রায় রোজই রেডিওতে বক্তৃতা করছেন। আরও বললাম যে তখন যুদ্ধের যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি তাতে রাঙাকাকাবাবুর পক্ষে

হঠাৎ বিমানে জাপানে আসা একেবারেই অসম্ভব। মাকে শান্ত করে বেরিয়েই দেখি শ্রীমতী লীলা রায় উপরে উঠছেন। তাঁরও একই অবস্থা—একই কথা বলে শ্রীমতী রায়কে বোঝালাম যে খবরটি সত্য হতে পারে না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শ্রীমতী রায় বার বার থম্‌কে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেক বারই আমাকে একই কথা বলতে হল।



আনন্দবাজার পত্রিকা

সোমবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৪৮ সাল

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

'রয়টার' পরকীয় সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরা শোক-লিখন লিখিব না।

সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন।

১৯৪২-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়

Hindusthan Standard

MONDAY, MARCH 30, 1942.

SRI SUBHAS CHANDRA

'Reuter' announces the death of Sri Subhas Chandra on information gathered from Lyons and Vichy radios. We refuse to write an obituary notice. Long live Sri Subhas Chandra!

১৯৪২-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচারের পর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয়

মাজননী তো প্রথম থেকেই খবরটা বিশ্বাস করেননি বলে শুনলাম। তবুও তাঁকে সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে এলাম। মাজননী ও মাকে বসিয়ে রাঙাকাকাবাবুর বেতার বক্তৃতা শোনালাম। কিন্তু দেশের, বিশেষ করে সুভাষপ্রেমী আপামর জনসাধারণকে বোঝাবে কে? তাদের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হল আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয়র কয়েকটি ছত্রে।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে ঐ সম্পাদকীয় ছাপাবার পর বাংলাদেশের তদানীন্তন ইংরাজ হোম সেক্রেটারী তাঁকে খুব চোখ রাঙিয়েছিলেন।

॥ ২০ ॥

সেই যে বাবার মেসেজ ছিল 'দি মেডিকেল স্টুডেন্ট ইজ অল রাইট'—আমার মনে হয় এতে রাঙাকাকাবাবু বুঝলেন যে, আমাকে পুলিশ সন্দেহ করেনি এবং আমি মুক্ত আছি। তাই কিছুকাল পরে ওঁর কাছ থেকে সোজাসুজি বার্তা নিয়ে যে বিশেষ দল ভারতে এল তাদের আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। বাবা তখন জেলে।

তবে সেই বিশেষ দল যখন ভারতবর্ষের মাটিতে নামল এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল তখন আর আমি ঠিক মুক্ত নই—গৃহে অন্তরীণ। প্রকৃতপক্ষে তার অনেক আগেই আমার বন্দী-জীবন শুরু হয়েছে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমার বন্দী জীবন নানাভাবে বিভক্ত ও বৈচিত্র্যময়।

৪২-এর আন্দোলনের সময় আমি প্রথম ধৃত হই। ৮ই আগষ্ট বোম্বাই-এ কংগ্রেসের সভায় Quit India প্রস্তাব পাশ হয়েছে খবর পেয়েই সেইদিন রাতে রাঙাকাকাবাবু আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দেশপ্রেমিক সব ভারতবাসীকে ঐ শেষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেন।

প্রথমতঃ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের একটি মিছিলের উপর পুলিশের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে আমি সপ্তাহ তিনেক শয্যাশায়ী ছিলাম। এর অল্পদিন পরেই আমি গ্রেপ্তার হই। যেদিন আমাকে ধরতে এল, ভোরবেলা দেখা গেল রাত থাকতে পুলিশ উডবার্ন পার্কের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। বাড়ির ভিতর সার্চ শুরু হবার আগে কোনমতে আমরা ভগৎরামের আনা বাংলায় লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে সমর্থ হই। সেদিন এ কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। আজ মনে হয় একটা অমূল্য দলিল নষ্ট হয়ে গেল। অন্য দু'টি লেখা বহু আগেই হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী থাকার সময় আমি টাইফয়েড রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার অসুস্থতা সত্য কিনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিয়ে আমাকে বন্দী অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। রোগশয্যায় শুয়ে এই সময় আমি বাবার কাছ থেকে জেল থেকে গোপনে পাঠানো কয়েকটি বার্তা পাই। আগেই বলেছি, এই সময় বাবা আমাকে কতকগুলি চমকপ্রদ খবর পাঠান। তার মধ্যে একটি ছিল যে, গভর্নমেণ্ট রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। বাবা এ কথাও লিখেছিলেন যে, হয়ত আমার গুরুতর অসুখ শাপে বর হয়েছে; নতুবা আমাকে হয়ত পুলিশ আগেই লালকেল্লা অথবা লাহোর ফোর্টে চালান দিত। কিঞ্চিৎ সুস্থ হবার পর আমি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে অন্তরীণ হলাম। তার কিছুকাল পরে অন্তরীণ অবস্থাতে আমার বাড়ি থেকে কলেজ যাতায়াতের অনুমতি মিলল।

১৯৪১-এর শেষেই ষ্টালিনগ্রাডে যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল। ১৯৪৩-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে বাড়িতে নজরবন্দী অবস্থায় রেডিও শুনছি। খুব ঘটা করে বার্লিন থেকে প্রচার করা রাঙাকাকাবাবুর একটি বক্তৃতা কেমন যেন ঠেকল। রাঙাকাকাবাবু প্রত্যেক বক্তৃতার প্রথমভাগে তাঁর পূর্বের বক্তৃতার পর দেশের ও বিদেশের ঘটনার

পর্যালোচনা করতেন। দেখলাম এই বক্তৃতায় উনি পুরোনো কথা বলছেন—আগের বক্তৃতায় যে সব কথা শুনেছি সেগুলিই যেন আবার রেকর্ডে শুনছি। হঠাৎ মনে হল রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে নেই—নিশ্চয়ই এশিয়ার পথে পাড়ি দিয়েছেন। মাকে আর বোন গীতাকে আমার অনুমান সেই রাতেই জানালাম। কি উপায়ে এশিয়ায় আসছেন অবশ্য আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। তখন মনে করেছিলাম হয়ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করে তুরস্ক ও সোভিয়েট সাইবেরিয়া হয়ে জাপানে আসবেন।

১৯৪৩-এর পূজার সময় স্বাস্থ্যোদ্ধারের অজুহাতে মা ও ছোট ভাইবোনদের নিয়ে দাদার কাছে বারারিতে যাবার সরকারী অনুমতি নিলাম। যে ঘরে বসে দাদা ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী "মহম্মদ জিয়াউদ্দিন"-এর সঙ্গে আমার "পরিচয়" করিয়ে দিয়েছিলেন সেই ঘরে বসেই রেডিও মারফত সিঙ্গাপুর থেকে রাঙাকাকাবাবুর নিজের মুখে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের ঘোষণাপত্র পাঠ শুনলাম।

১৯৪৩ সালটা এইভাবে চলল। বছরের শেষের দিকে রাঙা কাকাবাবুর বিশেষ বার্তাবহ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মাজননীর সবেমাত্র মৃত্যু হয়েছে, আমাদের অশৌচ চলছে। এমন সময় একদিন উডবার্ন পার্কে আমার সঙ্গে একজন দেখা করে রাঙাকাকাবাবুর নিজের হাতে লেখা একটি বার্তা আমার হাতে দিলেন। নীচের তলার পশ্চিমের যে ঘরে ভগৎরামের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম, সেই ঘরেই এই বিশেষ দূতের সঙ্গে কথা হল। এই ভদ্রলোকের নাম টি কে রাও, মাদ্রাজের অধিবাসী। উনি একটি ছোট দল নিয়ে সাবমেরিনে করে এসে কাথিয়াওয়াড় উপকূলে নেমেছেন। রাওকে রাঙাকাকাবাবু বলেছেন এই চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে। রাও বললেন, নেমেই আমরা নেতাজীর সঙ্গে রেডিও সংযোগ করেছি। ওঁর মায়ের মৃত্যুর খবর ওঁকে রেডিও বার্তায় জানানো হয়েছে। রাও আমাকে সংক্ষেপে সিঙ্গাপুরের সব সংবাদ দিলেন, তাঁরা রওনা হবার কিছু আগেই

আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপিত হয়েছে। রাঙাকাকাবাবু যে অপূর্ব জন-সমর্থন পেয়েছেন তার কথাও বললেন। সেই প্রথম আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে 'নেতাজী'র কথা শুনলাম, যাবার আগে রাও আমাকে 'জয় হিন্দ' অভিবাদন শিখিয়ে গেলেন।

টি কে রাও ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে। ইনি উত্তর আফ্রিকার টোব্রুকের বিখ্যাত লড়াইয়ে রোমেলের বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ইউরোপে স্থানান্তরিত হবার পর নেতাজীর ডাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। জার্মানীতে আই এন এ-র যে ছোট দলটিকে সিক্রেট সার্ভিস ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে ট্রেনিং দেওয়া হয়, রাও তাদের অন্যতম। রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ ছেড়ে সাবমেরিনে রওনা হবার পর আই এন এ-র মেজর স্বামী এই বিশেষ ট্রেনিং-প্রাপ্তদের একটি ছোট দল নিয়ে একটি ব্লকেড রানার জাহাজে চড়ে এই যুদ্ধের মধ্যে জীবনমৃত্যু হেলা করে নেতাকে অনুসরণ করে পূর্ব এশিয়ায় হাজির হলেন। রাও ছিলেন এই দলে। টি কে রাও ও তাঁর সঙ্গীরা সব দিক থেকে দক্ষ এবং নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন।

কলকাতায় রাও আমাকে তিন-চারটি নাম করে বললেন যে, আমি যেন এঁদের সঙ্গে রাও-এর যোগাযোগ করিয়ে দিই। যাঁদের নাম রাও করলেন তাঁদের কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না—কেউ বা জেলে, কেউ বা কলকাতায় নেই, কেউ বা অসুস্থ, ইত্যাদি।

আমার পক্ষে রাওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা নিরাপদ বা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, তখন আমাকে পুলিশ সর্বদাই অনুসরণ করে। আমাকে ঐ রকম অর্ধেক মুক্ত অর্ধেক বন্দী করে রাখাটা এখন মনে হয় পুলিশের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। তারা নজর রাখত কারা আমার কাছে আসে যায় বা আমি কি করি। বন্দী করে রাখার থেকে ওরা হয়ত এর ফলে বেশী লাভবান হয়েছিল।

আমি রাওকে বললাম, পরদিন মেট্রো সিনেমায় সন্ধ্যার শোর

সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ইতিমধ্যে আমি সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের ছোট ভাই সুধীররঞ্জন বক্সীর কাছে চলে গেলাম এবং রাও-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ভার নিতে বললাম। সুধীরবাবু তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। উনি কর্পোরেশনে কাজ করতেন। সেখানেই অফিসের সময়ে রাও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক হল। আমি রাও-এর একটি ছদ্মনাম দিলাম—'প্রসাদ'। এই নাম বললেই সুধীরবাবু বুঝবেন। ঠিক সেইমত সব হয়েছিল। তাঁদের দেখা হওয়ার পর কর্পোরেশন থেকে সুধীরবাবু ও 'প্রসাদ' দু'জনেই আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন।

এই ব্যবস্থার খবর দিতে পরদিন মেট্রো সিনেমায় আমি রাও-এর সঙ্গে মিলিত হলাম, দু'খানা টিকিট কেটে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে গিয়ে হলে পাশাপাশি বসলাম। ছবি শুরু হবার আগে সুধীরবাবুর সঙ্গে যা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। নিউজ রীল হয়ে যাবার পরই আমি অন্ধকার হল থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মেডিকেল কলেজে চলে গেলাম। রাওকে বলে গেলাম সিনেমা পুরোটা দেখতে। মেডিকেল কলেজে সেদিন সন্ধ্যায় একটি সোশ্যাল ছিল। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী। আমি সেখানে প্রথামত স্বাগত বক্তৃতাও করলাম। কয়েক শত ছাত্রছাত্রী আমার সেখানে উপস্থিতির সাক্ষী হয়ে রইল। মাঝপথে নেমে রাও-এর সঙ্গে মেট্রোতে সাক্ষাৎ গোপন রয়ে গেল।

রাও-এর দলের সঙ্গে সুধীরবাবুর মাধ্যমে বি ভি-র বিপ্লবীদের যোগাযোগ হল। এরা যুক্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। মধ্য কলকাতার একটি বাড়ি থেকে নেতাজীর সঙ্গে সরাসরি রেডিও সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আমি সন্ধ্যার পর বেড়াতে যাবার অছিলায় সুধীরবাবুর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম এবং সুধীরবাবু আমাকে কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখতেন। বি ভি-র কয়েকটি তরুণ বিপ্লবী এই সময় অসীম সাহসিকতার ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন। তাদের কথা আশা করি একদিন বিশদভাবে লেখা হবে।

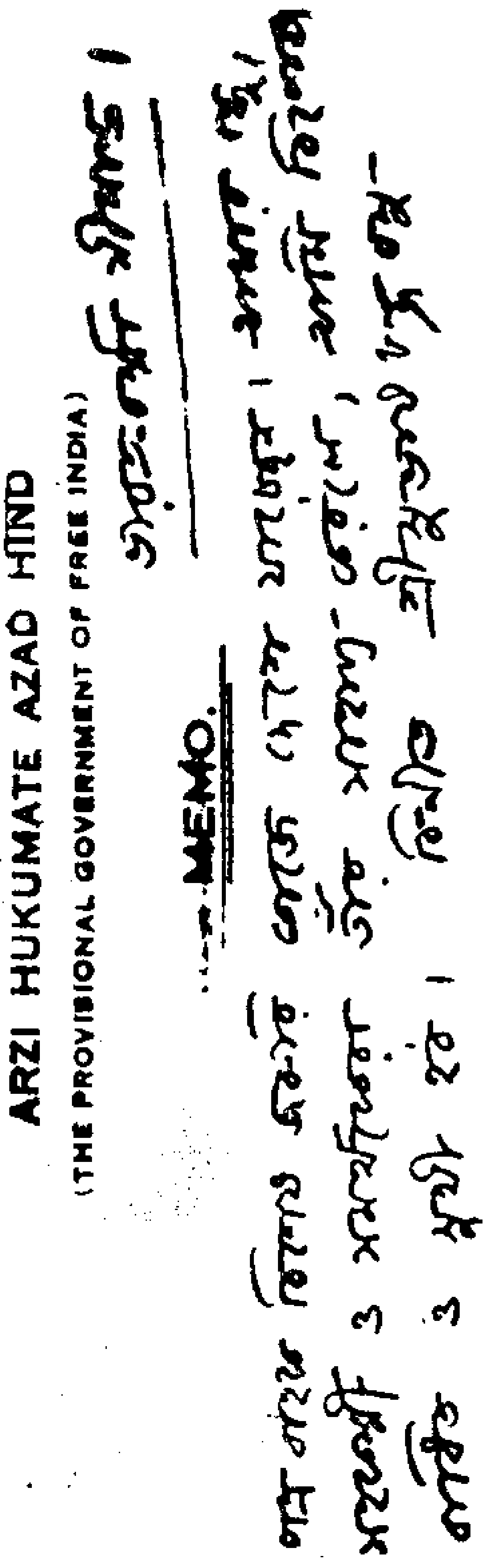
১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে মা আর এক বোনকে সঙ্গে করে বাবার সঙ্গে দেখা করতে কুন্নুর নীলগিরি পাহাড়ের বন্দী নিবাসে গেলাম। সবেমাত্র আমি সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়েছি।। সঙ্গে নিয়ে গেলাম রাঙাকাকাবাবুর চিঠি। সংক্ষিপ্ত বার্তাটি তিনি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্স লীগের সিঙ্গাপুরের সদর দপ্তরের ছাপা কাগজে লিখেছেন, তারিখ ছিল—'শ্রীশ্রীকালীপূজা, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৩'—'পত্রবাহক বিশেষ জরুরী কাজে দেশে যাচ্ছেন'—ইত্যাদি। বাবার সঙ্গে ইণ্টারভিউ-এর সময় কয়েক মিনিটের জন্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটি বাইরে গিয়েছিলেন ; সেই সুযোগে আমি বাবাকে সেই অমূল্য চিঠিখানি দেখাই এবং রাও-এর কাছে যে সব খবর আমি পেয়েছিলাম বাবাকে বলি। এইভাবে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বাবাকে চিঠিখানি দেখাতে পারায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছিলাম।

মাস তিনেক পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, পুলিশ দিনে দিনে আমাদের চারধারে তার জাল গুটিয়ে আনছে। আমাকে অনুসরণ করার মাত্রা খুব বেড়ে গেল। বাবার উপরও চিঠিপত্র লেখা ও দেখা করার ব্যাপারে নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। কিন্তু আমরা যেন খানিকটা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সুধীরবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ আগেকার মত রক্ষা করে চললাম। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে সর্বক্ষণ দু'জন পুলিশের লোক আমার পিছনে ছুটত। আমি মেডিকেল কলেজে যাই আসি—আমার কোটের পকেটে থাকে রাঙাকাকাবাবুর নিজের হাতে লেখা বার্তা। হাতেনাতে ধরা পড়লে তো সর্বনাশ! সুতরাং আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে চিঠিখানা দিয়ে এলাম। বললাম, আমাকে পুলিশ বড্ড শ্যাডো করছে, কখন কি হয়, চিঠিখানা আপনি রাখুন।

চিঠিটা হস্তান্তরের কয়েক দিন পরেই সুধীরবাবু ও আমি গ্রেপ্তার হই। সেই বন্ধুটি—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী. পরে আমাকে বলেছিলেন যে, চিঠিটি উনি নষ্ট করে দিতে বাধ্য হন।

আবার একটি অমূল্য জিনিস হারিয়ে গেল।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রায় অনুরূপ আর একটি বার্তা আজও



SECRET MESSAGE SENT TO INDIA THROUGH ONE OF HIS AGENTS.

পত্রবাহকের হাতে সুভাষচন্দ্রের গোপন চিঠির প্রতিলিপি

নেতাজী মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অপর একজন বার্তাবহ আর একটি চিঠি নিয়ে স্থলপথে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে আসছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি কিছুতেই সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেননি।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর উনি কলকাতায় আসেন এবং যেহেতু রাঙাকাকাবাবু আমার হাতে এই চিঠিটি দিতে বলেছিলেন, দেরিতে হলেও চিঠিটি আমার হাতে দেন। এই চিঠির ঠিকানা হলঃ ভারত-বর্মা সীমান্ত। আমাদের অনেক সৌভাগ্য, উত্তরকালের জন্য এটি আমরা সংরক্ষণ করতে পেরেছি।

পুলিশের জাল আমাদের উপর অবধারিতভাবে নেমে আসছে বুঝতে পেরে রাও-এর দলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় এবং ওরা গা ঢাকা দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে আমাদের অনেকরই জীবন রক্ষা হয়। আমার চার্জসীটে অভিযোগের মধ্যে and others কথা দু'টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল— and others ছিল নেতাজীর প্রেরিত দল। কিন্তু রাও-এর দলকে ধরতে না পারায় সরকারের পক্ষে অভিযোগ প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪-এর অক্টোবরে কলেজ যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে ঘিরে ফেলল এবং গাড়িতে তুলে লর্ড সিন্‌হা রোডে নিয়ে গেল। পরে আমাকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল এবং আমাকে নীচে বসিয়ে রেখে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হল। এবারও আমার মা সময়মত কিছু গোপনীয় কাগজপত্র বাথরুমের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পুলিশ আমাকে নিয়ে কোন অজানা গন্তব্যস্থানে চলে গেল। এরপর সাড়ে সাত মাস আমায় নিঃসঙ্গ কারাজীবন যাপন করতে হয়েছে—তার মধ্যে সাড়ে তিন মাস লাহোর ফোর্টে। আমার মা বা পরিবারের কেউ জানলেন না আমি কোথায় আছি বা আদৌ বেঁচে আছি কিনা। বন্দীশালায় বাবার আমার সম্বন্ধে চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁর জেল ডায়েরীর পাতা থেকে তাঁর গভীর দুশ্চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

January Saturday 20 1945

After bath when I sat down to pray (at about 2.15 P.M.) my mind was very much troubled with thoughts of Sisir. Has anything serious happened to Sisir? I prayed to the Divine

Mother with tears in my eyes and begged of Her to save Sisir. Will my prayers reach Her lotus feet?

At about 3.30 P.M. received Ami's letter of the 14th. He says that there is still no news about Sisir and that he will be going up to Delhi as soon as he can get train accommodation. May his mission prove successful! During my afternoon nap, dreamt that father came to me. Has the dream any meaning, good or bad?

সেই সময় আমি আমার বাবার যে গভীর বেদনার কারণ

JANUARY · SATURDAY 20 1945

Samvat.— 7 Magh (Sudi), 2001. Bengali.— 7 Magh, 1351.
Faslee.—22 Magh, 1352. Hijri —5 Safar, 1364.

After bath when I sat down to pray (at about 2.15 P.M.) my mind was very much troubled with thoughts of Sisir. Has anything ~~happ~~ serious happened to Sisir? I prayed to the Divine Mother with tears in my eyes and begged of Her to save Sisir. Will my prayers reach Her lotus feet?

At about 3.30 P.M. received Ami's letter of the 14th. He says that there is still no news about Sisir & that he will be going up to Delhi as soon as he can get train accommodation. May his mission prove successful! During my afternoon nap, dreamt that father came to me. Has the dream any meaning, good or bad?

1.30 PM – 98.4
9 PM – 98.3
Sugar – nil

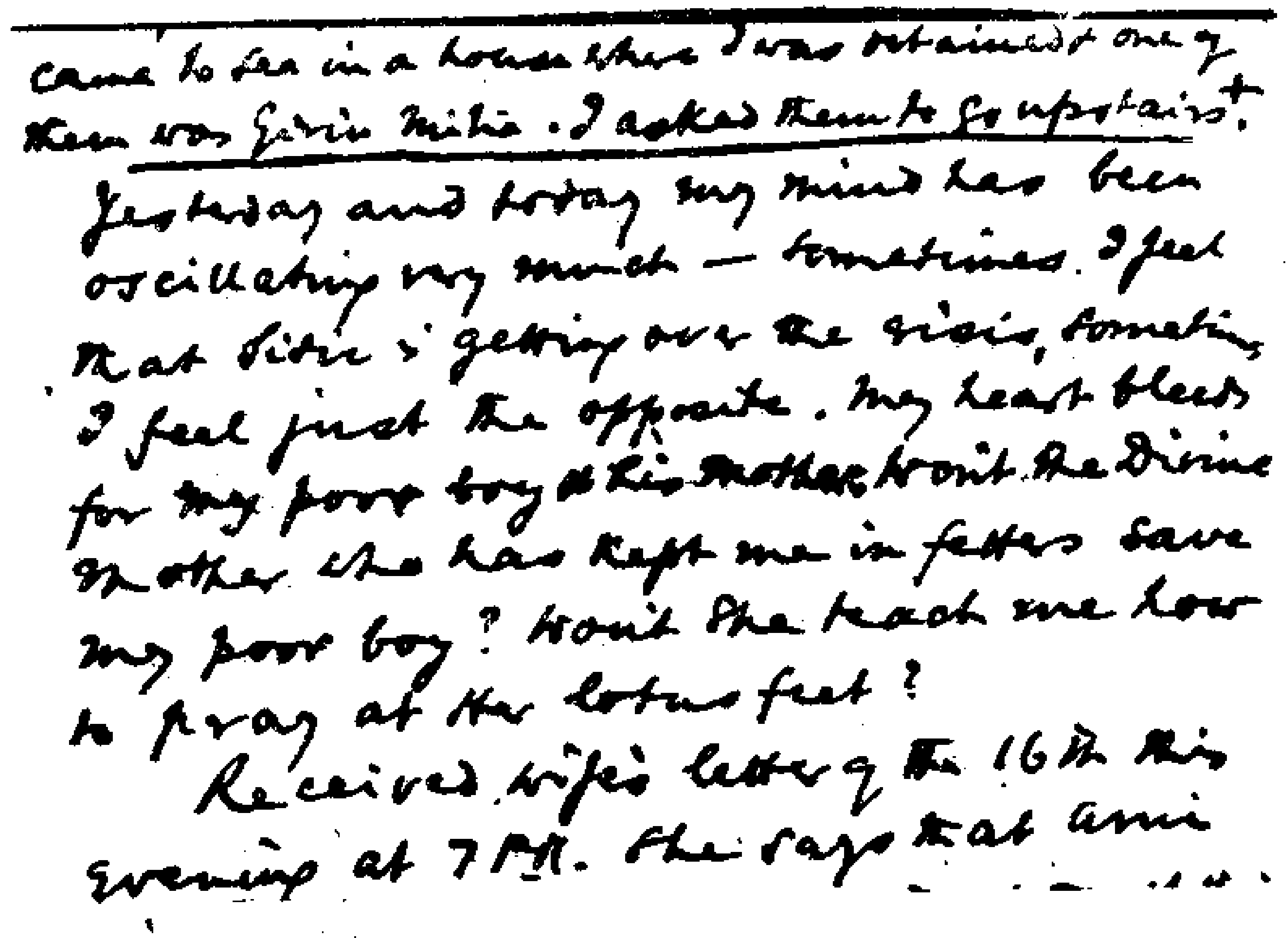
শরৎচন্দ্র বসুর জেলের ডায়েরীর একটি পাতা (জানুয়ারী ১৯৪৫)

হয়েছিলাম তা আজ তাঁর জেল ডায়েরীর পাতা উলটিয়ে বুঝতে পারি। আবার ২২শে জানুয়ারী দেখতে পাই তিনি লিখছেন ঃ

January — Monday 22 — 1945

Yesterday and today my mind has been oscillating very much—sometimes I feel that Sisir is getting over the crisis, sometimes I feel just the opposite. My heart bleeds for my poor boy and his mother. Won't the Divine Mother who has kept me in fetters save my poor boy? Won't She teach me how to pray at Her lotus feet?

আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা এই রকম। এক রাত্রি


came to see in a house where I was detained & one of
them was Girin Mitra. I asked them to go upstairs.
Yesterday and today my mind has been
oscillating very much — sometimes I feel
that Sisir is getting over the crisis, sometimes
I feel just the opposite. My heart bleeds
for my poor boy & his mother. Won't the Divine
Mother who has kept me in fetters save
my poor boy? Won't She teach me how
to pray at Her lotus feet?
Received wife's letter of the 16th this
evening at 7 PM. She says that ami

শরৎচন্দ্র বসুর জেলের ডায়েরীর আর একটি পাতা (জানুয়ারী ১৯৪৫)

কুখ্যাত লর্ড সিন্‌হা রোডের হাজতে কাটিয়ে পরদিন ভোর হবার আগে আমাকে একটি মিলিটারী এরোপ্লেনে তুলে দিল্লীর লাল-কেল্লার নিয়ে যাওয়া হল। যে পুলিশ অফিসারটি আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি হাতকড়াটি আমাকে দেখিয়ে সাবধান করে দিলেন। এইভাবে আমার জীবনে প্রথম এরোপ্লেন চড়ার অভিজ্ঞতা হল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খরচে—এই যা সান্ত্বনা।

দিল্লীর লালকেল্লার আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে যখন আমাকে ঠেলে

দেওয়া হল, হঠাৎ চোখে পড়ল দেওয়ালের গায়ে কয়লা দিয়ে আর কোন বন্দী বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়ে গেছে—Stone-walls do not a prison make—ইত্যাদি।

দিন দশেক সেখানে থাকার পর পাঞ্জাবী পুলিশের হেফাজতে ট্রেনে করে দিল্লী থেকে লাহোর। লালকেল্লার সেল থেকে লাহোর ফোর্টের ১২ নম্বর সেলের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সেই বিশেষরকম চাবি লাগানো হাতকড়া আর খোলা হল না। আজ লিখতে বসে একটা বিচিত্র অনুভূতির কথা মনে পড়ছে। দিল্লী স্টেশনের জনবহুল প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমাকে নিয়ে চলেছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, দু'দিকে বন্দুকধারী সেপাই-সান্ত্রী। আমি ব্যাকুলভাবে একবার এদিক একবার ওদিক চাইলাম, যদি কেউ আমাকে দেখতে পায় এবং খবরটা অন্তত কারুর কাছে পৌঁছে দেয়।

সেই সময় আমি দেখলাম, এত লোক কত তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত, কিন্তু কেউ আমার দিকে ফিরেও দেখছে না। আমার মনে হল সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীন সরকার গঠন করেছেন দেশের বাইরে। মুক্তিফৌজ নিয়ে তিনি দেশের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু হায়, তাঁর দেশবাসী এসব কিছুই জানে না। তারা নিরুৎসাহ নির্লিপ্ত মুখে তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত। তাঁরই কাজে সামান্য জড়িত থাকার জন্য আমাকে বিদেশী সরকার প্রকাশ্যভাবে বেঁধে নিয়ে চলেছে। কিন্তু কেউ তাতে বিচলিত নয়।

লাহোর ফোর্টে চারদিকে গরাদ দেওয়া একটি খোলা খাঁচায় পুরো শীতকালটা আমার এক বস্ত্রে কাটল। খাঁচার বাইরে ছিল একটি হরিণ। সে কাছে এসে বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে আমাকে দেখত, যেমন আমরা চিড়িয়াখানায় জন্তু-জানোয়ারদের দেখি।

লাহোর ফোর্টে আমার অজ্ঞাতবাস যখন চলছে তখন কলকাতায় আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুমহলে আমার গতিবিধি জানবার এবং সম্ভব হলে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা চলছিল। আমার মেজদাদা

অমিয়নাথ দিল্লী গিয়েও খোঁজখবর করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে সময়ে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ ভারতীয় বাঙ্গালী অফিসাররাও তাঁদের রাজভক্তি বজায় রেখে রূঢ়ভাবে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ব্যাপারে উচ্চমহলের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। পরিবারের এক বিশেষ বন্ধু ও একজন নিকট-আত্মীয় ভারত গভর্নমেন্টের প্রাক্তন ল'মেম্বার ও আইন-ব্যবসায়ে বাবার 'গুরুজী' স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে গেলেন। তাঁরা অবশ্য আমার গোপন কার্যকলাপের কথা কিছু জানতেন না। সরকার সাহেবকে তাঁরা বললেন যে আমি নিতান্তই ভালমানুষ, সাতে-পাঁচে থাকি না, ভারত গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই ভুল করে আমাকে বন্দী করে রেখেছেন। তাঁরা সরকার সাহেবকে সরাসরি লর্ড ওয়েভেলকে আমার বিষয়ে লেখবার অনুরোধ জানান। সরকার সাহেব বললেন, শরতের সম্বন্ধে কোন কথা তো ওরা কানেই তুলবে না। কিন্তু ছেলেটির সম্বন্ধে আমি লিখব। ওয়েভেল প্রথমতঃ উত্তর দিলেন যে তিনি হোম ডিপার্টমেণ্টের গোপনীয় সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, তবে সরকার সাহেবের খাতিরে আমার ফাইলটা চেয়ে পাঠাবেন। —পরে ওয়েভেল লেখেন যে আমার সম্বন্ধে সরকার সাহেবের ধারণা ঠিক নয়, আমি একজন "dangerous boy" এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। তাঁরা চান যে আমার বিচার হোক এবং উপযুক্ত শাস্তি পাই, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তাঁরা তা করতে পারছেন না। ওয়েভেলের চিঠি স্যার নৃপেন আমার মাকে ডেকে দেখালেন, মা চিঠিখানা পড়ে নীরবে ফিরে এলেন।

নিয়মিত প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হবার আগে ফোর্টের ঝানু স্পেশ্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝে মাঝে খাঁচার বাইরে থেকে নানাভাবে আমার উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতেন। বলতেন, দেখ, এখানে তো কেবল অতি বিপজ্জনক ব্যক্তিদের আনা হয়—যারা গোপনে রাজদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত, এককথায় যারা রিভলিউশনারি। তুমি

এখানে এসেছ কেন? তারপর বলতেন, লাহোর ফোর্টে যারা আসে তাদের এখানে যুগ কেটে যায়। জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা বড় একটা কেউ ঘরে ফেরে না।

সত্যি কথা, লাহোর ফোর্টে আমার যেন নিজের সত্ত্বাও ওরা রাখতে দেবে না। ওষুধের শিশির ওপর এক অদ্ভুত নাম দেখে একদিন বুঝলাম যে, ওরা আমার নামও বদলে দিয়েছে। ওরা বলল, ঠিকই তো, তোমার এখানকার নাম সন্‌সার চন্দ্‌। অর্থাৎ কোন রেকর্ডেই আমার আসল নাম থাকবে না। কে প্রমাণ করবে যে শিশির বসু বলে এখানে কেউ ছিল!

দীর্ঘ ইন্‌টেরোগেশনের শেষের দিকে আমি একদিন ফোর্টের কর্তা নজির আহমদ রিজভিকে বলে ফেললাম, তোমরা আমার কেরিয়ারটাই নষ্ট করে দিলে। উত্তরে সে বললে—দেখ, তোমাকে একটা কথা বলব। আমার বাবাও এই লাহোর ফোর্টের অফিসার ছিলেন এবং তার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই এখানে আসছি। আমি আমার অ-আ-ক-খ শিখেছি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের কাছে—

I learnt my alphabets from India's greatest revolutionaries.

তুমি ও আমি বিপক্ষ দলের লোক। তবুও আমি বলছি, লাহোর ফোর্টে কারুর কেরিয়ার নষ্ট হয় না। শুরু হয়। আমার এখানেই শুরু। এখানেই শেষ। কিন্তু তোমার জীবন এখানে শুরু।

আমারও কেমন মনে হল লাহোর ফোর্টে নিগৃহীত হবার গৌরব লাভ করে আমি ধন্য। বহু যুগ আগে এক রাত্রে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে গিয়েছিলেন সিদ্ধিলাভের আশায়। তিনি ইতিহাসের পাতায় ফিরে এলেন গৌতম বুদ্ধ রূপে। আধুনিক কালে আর এক রাত্রে অন্য এক সিদ্ধিলাভের জন্য গৃহত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র। ইতিহাসের পাতায় তিনি প্রত্যাগত নেতাজী রূপে। তাঁর সেই ঐতিহাসিক গৃহত্যাগে আমার যে অতি সামান্য ভূমিকা তা আমার জীবনকে ধন্য করেছে।